জয় বাংলা

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৪

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার

শান্তি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

পটভূমি

আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ। শুরু হয়েছে দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের ঐতিহাসিক কালপর্ব। পূর্ণ হয়েছে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪২ বছর। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুমহান নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় বিশ্ব ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। স্বাধীনতা বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেবল এই অর্জনের রূপকারই নয়; ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি বাঙালি জাতির যা কিছু মহৎ অর্জন– বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়, ভাষা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিরও রূপকার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই সূচিত হয়েছিল উন্নত-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' নির্মাণের মহৎ কর্মযজ্ঞ। যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার ভেতর দিয়ে আবার মুখ থুবড়ে পড়ে বাংলাদেশ। ৩ নভেম্বর কারাগারে আটক চার জাতীয় নেতাকেও একই খুনি চক্র হত্যা করে। খুনি মোশতাক ও জিয়া চক্র স্বাধীন বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্রের ধারা। সামরিক ফরমানের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করা হয়; নিষিদ্ধ ঘোষিত দলগুলোকে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়ে পুনর্বাসিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অঙ্গীকার হয় নির্বাসিত। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ বিরোধিতাকারী, যুদ্ধাপরাধী এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত জামাতে ইসলামী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের কেবল পুনর্বাসিতই করা হয় নি, সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান এবং পরবর্তীকালে তার উত্তরসূরি খালেদা জিয়া তাদের রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করে। অবৈধ সামরিক শাসকরা সংবিধান কর্তন, জনগণের ভোটাধিকার হরণ এবং নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সামরিক ছাউনিতে গড়ে তোলা হয় একাধিক রাজনৈতিক দল। হত্যা-ক্যু-পাল্টা ক্যু হয়ে দাঁড়ায় নিত্যদিনের ঘটনা। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থে সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার, মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও জওয়ানদের হত্যা

এবং চাকরিচ্যুত করার মাধ্যমে দুর্বল করা হয় মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী গৌরবোজ্জ্বল সেনাবাহিনীকে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মের অপব্যবহার, কালো টাকা, পেশিশক্তি, দুর্নীতি, লুটপাট এবং দুর্বৃত্তায়নকে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিতে পরিণত করা হয়। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও ক্ষমতাসীন বিএনপি স্বৈরশাসনের এ ধারাই অব্যাহত রাখে। এভাবেই পঁচাত্তর-পরবর্তী সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের অর্জন এবং একটি সুখী সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার সকল সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেয়।

বাংলাদেশের স্বর্ণযুগ (১৯৯৬-২০০১)

এই দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটে ১৯৯৬ সালে। দেশবাসীর বীরত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং অগণিত শহীদের আত্মদানের পটভূমিতে ১২ জুন অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। দীর্ঘ ২১ বছর পর আবার আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। বঙ্গবন্ধু-কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যগাঁথা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। মাত্র পাঁচ বছরে খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, দ্রব্যমূল্য হ্রাস, মূল্যস্ফীতির হার ১.৫৯ শতাংশে নামিয়ে আনা, প্রবৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশে উন্নীতকরণ, গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, দারিদ্র্য বিমোচনে নানা উদ্ভাবনী কর্মসূচি গ্রহণ ও হত-দরিদ্র মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ, মানব দারিদ্র্য সূচক দ্বিগুণ হারে কমিয়ে আনা, সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং ২১ ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা লাভ প্রভৃতি অর্জন বাংলাদেশকে বিশ্বে অমিত সম্ভাবনার দেশ হিসেবে পরিচিত করে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে অর্জিত হয় অভূতপূর্ব সাফল্য। মাত্র পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩০০ মেগাওয়াট। যমুনা নদীতে বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ, ৬২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা, ১৯ হাজার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ নির্ভরযোগ্য ভৌত কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করে। ওই সময়ে দেশে ছোট-বড় ১ লাখ ২২ হাজার শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। সরকারি ও বেসরকারি খাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। মনোপলি ভেঙে স্বল্পমূল্যে সবার হাতে মোবাইল, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তিকে সকলের জন্য অবারিত করে দেওয়া হয়। সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য গ্রহণ করা হয় কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি।

আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিল, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার, জেলহত্যার বিচার প্রক্রিয়া শুরু এবং আইন সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, নারীনীতি প্রণয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন, সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর প্রথা চালু, স্থায়ী কমিটিতে মন্ত্রীর বদলে সদস্যদের চেয়ারম্যান নিয়োগ, চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য আইন প্রণয়ন এবং সরকারের সর্বস্তরে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ সর্বক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধের ধারা। ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ।

সম্ভাবনার অপমৃত্যু : বিএনপি-জামাত দুর্বৃত্তকবলিত বাংলাদেশ

পক্ষপাত দুষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মদতে কারচুপি ও কারসাজির ফলে ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিশ্চিত বিজয় ছিনতাই হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-জামাত জোট প্রায় সমান সংখ্যক (৪০ শতাংশ) ভোট পেলেও বিএনপি-জামাত জোটের জন্য দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন নিশ্চিত করা হয়। প্রশ্নবিদ্ধ হয় নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের ধারণা।

রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিএনপি-জামাত জোট তাদের পাঁচ বছরের দুঃশাসনে বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করে। হত্যা, সন্ত্রাস, রক্তপাত, জঙ্গিবাদী উত্থানের ফলে বাংলাদেশ পরিণত হয় মৃত্যু উপত্যকায়। স্বয়ং খালেদা জিয়া এবং তার পুত্র তারেক রহমানের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট জননেত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেনেড হামলা করে হত্যার চেষ্টা চালাতে গিয়ে নারী নেত্রী বেগম আইভি রহমানসহ আওয়ামী লীগের ২২ নেতাকে হত্যা করা হয়।

হত্যা করা হয় সংসদ সদস্য ও সাবেক অর্থমন্ত্রী এএসএম কিবরিয়া, সংসদ সদস্য ও শ্রমিক নেতা আহসানউল্লাহ মাস্টার, অ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম ও সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজউদ্দিনসহ আওয়ামী লীগের ২১ হাজার নেতা-কর্মীকে। হত্যা করা হয় হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বিশিষ্টজনসহ বহুসংখ্যক মানুষকে।

সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের শিকার হয় ধর্মীয় সংখ্যালঘু লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শত শত নারী এবং শিশু-কিশোরী হয় গণধর্ষণ ও ধর্ষণের শিকার। সাংবাদিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী, কৃষক, শ্রমিক কেউই বিএনপি-জামাত জোটের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও ফ্যাসিস্ট হামলার হাত থেকে রেহাই পায় নি। মন্ত্রিসভায় স্থান পায় চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীরা।

সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় উগ্র জঙ্গিবাদের সশস্ত্র উত্থান ঘটে। ১৭ আগস্ট, ২০০৫ তারিখে দেশের ৬৩টি জেলায় একই সময়ে পাঁচ শতাধিক স্থানে বোমা বিস্ফোরণ

ঘটায়, বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলের বিভিন্ন সময়ে আদালত, সিনেমা হল, মেলা, দরগা, মসজিদ, গীর্জা, মন্দির, অফিস, সভা-সমাবেশ প্রভৃতি স্থানে জঙ্গিবাদীদের বোমা হামলায় বিচারক, আইনজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীসহ অসংখ্য মানুষ নিহত হয়। আহত হয় ও চিরদিনের জন্য পঙ্গুত্ববরণ করে হাজার হাজার মানুষ। বাংলাদেশ পরিণত হয় জঙ্গিবাদীদের অভয়ারণ্যে। সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের কালো তালিকাভুক্ত হয় বাংলাদেশ।

অন্যদিকে দেশ পরিচালনায় বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সামগ্রিক ব্যর্থতা, অদক্ষতা, দুর্নীতি, দলীয়করণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকেই উল্টে দেয়। নস্যাৎ করে দেয় সব সম্ভাবনা। তারেক রহমানের উদ্যোগে গড়ে তোলা হয় রাষ্ট্রক্ষমতার সমান্তরাল বা বিকল্প কেন্দ্র 'হাওয়া ভবন'। এই হাওয়া ভবন থেকেই ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। 'হাওয়া ভবন' হয়ে উঠেছিল সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সিন্ডিকেট, চাঁদাবাজি ও কমিশন সংগ্রহ, প্রশাসনের নিয়োগ-বদলি, অবৈধ অস্ত্র ও মাদক ব্যবসা প্রভৃতি দেশবিরোধী অবৈধ কর্মকাণ্ডের অঘোষিত হেড কোয়ার্টার। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের মন্ত্রী, এমপি এবং দলীয়/অঙ্গ/সহযোগী সংগঠনের দুর্নীতি, দৌরাত্ম্য দেশবাসীর জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। জোট সরকারের পাঁচ বছরের শাস-নামলের পাঁচ বছরই টিআইবির রেটিংয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করে।

হাওয়া ভবনের মদতপুষ্ট অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট সৃষ্টি করে কৃত্রিম সংকট। আওয়ামী লীগ আমলের তুলনায় দ্রব্যমূল্য ১০০-২০০ গুণে বৃদ্ধি পায়। মূল্যস্ফীতি আওয়ামী লীগ আমলের ১.৫৯ থেকে ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। তারেক রহমান, আরাফাত রহমান ও বিএনপির মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও দলীয় ব্যক্তিরা আমদানি ব্যবসা করার প্রতি বেশি তৎপর ছিল; তারা বাংলাদেশকে আত্মনির্ভরশীল করতে চায় নি। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথেই বিএনপি সরকার বেশি যুক্ত ছিল। তারা নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখে দেশ ও জনগণের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছে। রাতারাতি হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছে। অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছিল দেশ। এসবের ফলে আওয়ামী লীগ আমলে খাদ্যে আত্মনির্ভরশীল দেশ আবার খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত হয়। আবার মঙ্গা দেখা দেয়; খাদ্যাভাব ও কর্মসংস্থানের অভাবে মানুষের মৃত্যু সংবাদ সংবাদপত্রের হেডলাইন হয়। আওয়ামী লীগ আমলে চালু কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাক্ষরতার হার ৬৫ থেকে আবার ৫০ শতাংশে নেমে আসে। ১৯৯৭ সালের নারীনীতি ও শিক্ষানীতি বাতিল করা হয়। নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সৃষ্ট স্থবিরতা আওয়ামী লীগ আমলের উন্নয়নের ধারাকে বানচাল করে দেয়।

টানা পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকলেও বিএনপি-জামাত জোট সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে পারে নি; বরং কার্যকর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১ হাজার মেগাওয়াট হ্রাস পায়। গ্যাস উৎপাদনেও বিরাজ করে স্থবিরতা। কিন্তু খালেদা-পুত্র তারেক ও তার বন্ধুর খাম্বা লিমিটেডের অতিমুনাফা ও লুটপাটের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য শত শত কোটি টাকার বিদ্যুতের খুঁটি ক্রয় করা হয়। বিদ্যুতের দাবি জানানোর অপরাধে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কানসাটে এক বছরে ১৭ কৃষককে গুলি করে হত্যা করা হয়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে। ফলে দেশের শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ মুখ থুবড়ে পড়ে। এর পাশাপাশি সার, বীজ, ডিজেল প্রভৃতি কৃষি উপকরণের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য মারাত্মকভাবে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়। কৃষিতে সৃষ্টি হয় স্থবিরতা।

প্রশাসন, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পুলিশ প্রশাসনসহ সর্বস্তরে নির্লজ্জ দলীয়করণ, চাকরিচ্যুতি, দখল, অবদমন প্রভৃতির ফলে সুশাসন ও ন্যায় বিচারের অবসান ঘটে। বিএনপি-জামাত জোট দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস ও নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে অর্থহীন করে তোলে। দলীয় অনুগত ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা করার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করে প্রধান বিচারপতির চাকরির বয়সসীমা দুই বছর বৃদ্ধি, আজ্ঞাবহ অযোগ্য ব্যক্তিদের বিচারপতি ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ, ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার করেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা কারচুপি ও ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নীল-নকশা কার্যকর করার মরিয়া প্রচেষ্টা চালায়। ২০০৬ সালে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও জনমত উপেক্ষা করে বিএনপির দলীয় রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন নিজেকে একতরফা-ভাবে 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক' সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা করেন। কিন্তু হাওয়া ভবনের আজ্ঞাবহ ইয়াজউদ্দিনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেও দলীয় নীল-নকশা বাস্তবায়নের হাতিয়ারে পরিণত করার পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়ে দফায় দফায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা পদত্যাগ করেন। ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নীল-নকশা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ড একটি অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অসম্ভব করে তোলে। এ পটভূমিতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। দেশে জরুরি অবস্থা জারি ও সংসদ নির্বাচন স্থগিত করা হয়। ড. ইয়াজউদ্দিন প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে অপসারিত হন। সেনাবাহিনীর সমর্থনে ড. ফখরুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত হয় নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

বিরাজনীতিকরণের রাজনীতি ও মাইনাস টু'র অপপ্রয়াস

সেনাসমর্থিত এই নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার জরুরি অবস্থার সুযোগে ঢালাওভাবে রাজনীতিবিদদের চরিত্র হনন ও নির্যাতনের পথ গ্রহণ করে। শুরু হয়

বিরাজনীতিকরণের নামে প্রচ্ছন্ন সামরিক শাসন। দীর্ঘদিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকে। কেবল রাজনীতিবিদই নয়, দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, সাধারণ দোকানদার, ফেরিওয়ালা এবং ছাত্রসমাজ হয় নির্যাতন-নিপীড়ন ও হয়রানির শিকার। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অবিলম্বে নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানালেও, তারা তা উপেক্ষা করে। সংবিধান-বহির্ভূত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত প্রলম্বিত করা হয়।

ইতোমধ্যে প্রচার করা হয় মাইনাস টু ফর্মুলা। কার্যত বঙ্গবন্ধু-কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে বিরত রাখার লক্ষ্য থেকেই এই তত্ত্ব হাজির করা হয়। বিদেশ গমন করলে জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা ভয়-ভীতি-নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে দেশে ফিরে আসার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলেন। ফলে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। মাথা উঁচু করে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু গ্রেফতার নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং সরকারি কার্যক্রমের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরায় এর কিছুদিন পরেই ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই কোনো পরোয়ানা ও অভিযোগ ছাড়াই বঙ্গবন্ধু-কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয়। দায়ের করা হয় একের পর এক মিথ্যা মামলা। নির্জন বন্দী অবস্থায় তার ওপর চালানো হয় মানসিক নির্যাতন, এমনকি তার জীবন সংশয়ও দেখা দেয়।

সেনাসমর্থিত এই সরকারের সময়ে মাইনাস টু ফর্মুলা কার্যকর করা, বড় রাজনৈতিক দলে ভাঙন সৃষ্টি, সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর সহযোগিতায় একাধিক ব্যক্তির নতুন রাজনৈতিক দল– কিংস পার্টি গঠনের উদ্যোগ, এমনকি সেনাবাহিনী প্রধানের রাষ্ট্রপতি হওয়ার মতো রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সাংবিধানিক ধারাকেই বিপন্ন করে তোলে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সাংবিধানিক ধারা অক্ষুণ্ন রাখা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং অবিলম্বে সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবিতে সারাদেশে জনমত গড়ে তোলে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার একপর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনাকে ছাড়া কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা এবং হতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আমাদের দাবির প্রেক্ষিতে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বক্স ব্যবহার করা হয়। নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য সাংবিধানিক সংস্থা পুনর্গঠিত হয়। নির্বাচনী আইন ও রাজনৈতিক দলবিধিতেও ইতিবাচক সংস্কার/সংশোধনী আনা হয়। জননেত্রী শেখ হাসিনাকে মুক্তি দেওয়া হয়। দীর্ঘ দুই বছরের মাথায় ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সংসদের প্রায় নয়-দশমাংশ আসনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার দিনবদলের সনদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায় দেশবাসী। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার শপথ গ্রহণ করে। সংকটজাল ছিন্ন করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা হয় অবারিত।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের পাঁচ বছর : বদলে যাওয়া দৃশ্যপট

আমরা আমাদের অঙ্গীকার পূরণ করেছি। তবে আমাদের অঙ্গীকার ও কর্মসূচি কেবল পাঁচ বছরের জন্য ছিল না। বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম কোনো রাজনৈতিক দল একটা দীর্ঘমেয়াদি সুস্পষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। ২০০৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত রূপকল্প-২০২১ বা ভিশন আমরা উপস্থাপন করেছিলাম। সদ্য সমাপ্ত পাঁচ বছর মেয়াদে আমরা এই কর্মসূচি ও রূপকল্প-২০২১-এর যে অংশটি বাস্তবায়িত করেছি, এখানে তার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হলো–

- অতীতের অনিশ্চয়তা, সংকটের চক্রাবর্ত এবং অনুন্নয়নের ধারা থেকে বের করে এনে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শান্তি, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের গতিপথে পুনঃস্থাপিত করা হয়।

- রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-১৫)। উভয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- গত নির্বাচনী ইশতেহারে যে 'পাঁচটি অগ্রাধিকারের বিষয়' নির্ধারিত হয়েছিল, সেসব ক্ষেত্রে কেবল কাঙ্ক্ষিত সাফল্যই অর্জিত হয় নি, কোনো কোনো খাতে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

- কঠোর হস্তে ভোক্তা অধিকার রক্ষা এবং মূল্য সন্ত্রাস বন্ধ করা হয়। চাল, ডাল, আটাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর ঊর্ধ্বগতি রোধ, চালের দাম হ্রাস এবং জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখা হয়। মূল্যস্ফীতির হার ১১ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭.৫ শতাংশে স্থিতিশীল করা হয়। পক্ষান্তরে জনগণের আয়-রোজগার ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

- টাস্ক ফোর্স গঠন, রপ্তানিকারকদের আর্থিক প্রণোদনাদানসহ দক্ষতার সঙ্গে বিশ্বমন্দার অভিঘাত ও প্রভাব সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করা হয়। বিশ্ব পরিসরে প্রবৃদ্ধি এবং বাণিজ্যের নিম্নগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা কেবল চালুই থাকে নি, এই প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাদেশে গড়ে ৬.২ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতিতে বিএনপি জোট সরকারের আমলের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের তুলনা করলেই

সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, কারা দেশকে দ্রুত উন্নত-সমৃদ্ধ করতে সক্ষম। অর্জিত সাফল্যের নিম্নলিখিত তুলনামূলক চিত্রের দিকে তাকালেই এ সত্যই প্রতিভাত হবে যে, এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অবশ্যই একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

খাত	২০০৫-০৬ (বিএনপি-জামাত জোট আমল)	২০১২-১৩ (আওয়ামী লীগ আমল)
প্রবৃদ্ধি	৫.৭ শতাংশ	৬.২ শতাংশ
মাথাপিছু আয়	৬২৫ ডলার (২০০৮ সাল)	১০৪৪ ডলার
জাতীয় সঞ্চয়	২৭.৭ শতাংশ	২৯.৫ শতাংশ
বিনিয়োগ (জাতীয় আয়ের)	২৪.৭ শতাংশ	২৬.৮ শতাংশ
বাজেটের আকার	৫৯.০৩০ কোটি টাকা	১,৭৪,২১৪ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্যের অঙ্গীকার	১৭৮৭ মিলিয়ন ডলার	৫৯৩৫ মিলিয়ন ডলার
বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার	১৫৬৭ মিলিয়ন ডলার	২৭৭২ মিলিয়ন ডলার
প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স)	১৩ বিলিয়ন ডলার	৪৮ বিলিয়ন ডলার
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩.৮৮ বিলিয়ন ডলার	১৮ বিলিয়ন ডলার
রপ্তানি আয়	১০.০৫ বিলিয়ন ডলার	২৭.১ বিলিয়ন ডলার
আমদানি ব্যায়	১৪.৭ বিলিয়ন ডলার	৩৪.১ বিলিয়ন ডলার
খাদ্য উৎপাদন	২৭৮ মিলিয়ন টন	৩৭৫ মিলিয়ন টন
দারিদ্র্য হার	৪১.৫১ শতাংশ	২৬.২০ শতাংশ
অতি দরিদ্র হার	২৫.১ শতাংশ	১১.৯ শতাংশ
বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা	৩,৭৮২ মেগাওয়াট	১০,০০০ মেগাওয়াট
ন্যূনতম মজুরি	১,৬৬২ টাকা	৫,৩০০ টাকা
ক্ষেতমজুর বা কৃষি শ্রমিকদের দৈনিক মজুরিতে চাল ক্রয়ের সক্ষমতা	৩.৫-৪.৫ কেজি	১০-১২ কেজি

সামষ্টিক অর্থনীতির এই চিত্র আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসাসূচক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এ কথা সবাই স্বীকার করবেন, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের পাঁচ বছরে আমাদের জাতীয় বাজেটের আয়তন ২০০৬-এর তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩.৭ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। রেমিট্যান্স বেড়েছে ৩.৭ গুণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫ গুণ, যা এ যাবতকালের

সর্বোচ্চ। রপ্তানি আয় বেড়েছে আড়াই গুণ। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষমতা ৩ গুণের বেশি বেড়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ ১০ হাজার মেগাওয়াটে পৌঁছেছে।

- বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলের পাঁচ বছরই বাংলাদেশ শীর্ষ দুর্নীতিপরায়ণ দেশ হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। গত পাঁচ বছরে সেই দুর্নাম বহুলাংশে মোচন হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন পুনর্গঠন করেছে। দুর্নীতির তদন্ত, অনুসন্ধান, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে দুদক প্রয়োজনে মন্ত্রী, আমলাসহ যে-কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদের নজির স্থাপন করেছে। দুর্নীতি ও অনিয়মের উৎসমুখগুলো বন্ধ করার লক্ষ্যে অনলাইনে টেন্ডারসহ বিভিন্ন সেবা খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে দুর্নীতির সর্বগ্রাসী প্রকোপ কমেছে।

- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অর্জিত হয়েছে অভূতপূর্ব সাফল্য। জরুরি আপদকালীন ব্যবস্থা ছাড়াও মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে ইতোমধ্যেই বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান হয়েছে। ২০১৩ সালের মধ্যে ৭ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ইতোমধ্যে তা ১০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। আঞ্চলিক বিদ্যুৎ বাণিজ্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। ভারত থেকে আমদানি করা হচ্ছে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাহায্যে ২০০০ মেগাওয়াটের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। মংলা ও চট্টগ্রামে কয়লাভিত্তিক আরও দুটি বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। দেশের ৬২ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। নতুন নতুন গ্যাসকূপ খনন, গ্যাসক্ষেত্র এবং দুটি তেলক্ষেত্র আবিষ্কার হয়েছে। শিল্প-কারখানা এবং গৃহস্থালী কাজে নতুন গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

- দারিদ্র্য বিমোচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের অভূতপূর্ব সাফল্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনসহ কয়েকটি ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (MDG) নির্ধারিত ২০১৫ সালের দুই বছর আগেই অর্থাৎ, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০১৩ সালে সাধারণ দারিদ্র্যসীমা ২৬.২ শতাংশে এবং হত-দরিদ্রের হার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১১.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। প্রায় ৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে মধ্যবিত্তের স্তরে উঠে এসেছে। কমেছে আয়-বৈষম্য।

- গত পাঁচ বছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রায় ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংগঠিত খাতে ৬৯ লাখ মানুষের এবং বিদেশে প্রায় ২৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। মাত্র ৩৩ হাজার ২৭৪ টাকা ব্যয় করে মালয়েশিয়ায় সরকারিভাবে শ্রমিক নিয়োগ, সৌদি আরবে 'ইকামা' পরিবর্তনের সুবাদে ৪ লক্ষাধিক কর্মী বৈধ হয়েছে। বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান ও ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত আছে। ন্যাশনাল সার্ভিসের আওতায় প্রায় ৫৭ হাজার প্রশিক্ষণার্থী তরুণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

- নির্বাচনী ইশতেহার-২০০৮-এ সুশাসন প্রতিষ্ঠা ছিল অন্যতম অগ্রাধিকারের বিষয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, শুরুতেই এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারকে হোঁচট খেতে হয়; মোকাবিলা করতে হয় অকল্পনীয় চ্যালেঞ্জ। জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করার মাত্র ৫২ দিনের মাথায় সংঘটিত হয় রক্তাক্ত বিডিআর বিদ্রোহ। চরম ধৈর্য, অসীম সাহস ও রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিডিআর বিদ্রোহের শান্তিপূর্ণ সমাধান করেন। সেনাবাহিনীতে আস্থা ফিরিয়ে আনেন। ইতোমধ্যে বিডিআর বিদ্রোহের ১৮ হাজার আসামির বিচার সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া ফৌজদারি কার্যবিধিতে ৮৫০ জন অভিযুক্তের বিচার করা হয়েছে। এই বিচার সেনাবাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। বিডিআর বিদ্রোহের কলঙ্ক মোচনের উদ্দেশ্যে এই বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) রাখা হয়েছে। নতুন আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে।

- বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকর করা হয়েছে, সম্পন্ন হয়েছে জেলহত্যার বিচার। উন্মুক্ত হয়েছে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথ।

- নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে ১০ যুদ্ধাপরাধীর বিচার সম্পন্ন হয়েছে। কার্যকর করা হয়েছে কাদের মোল্লার ফাঁসির রায়।

- সংসদকে কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক করতে সংসদের প্রথম অধিবেশনেই ৫০টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। বিরোধী দল থেকেও সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৫০ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান সামরিক ফরমান বলে '৭২-এর সংবিধান সংশোধন করে। পরবর্তীকালে সেনাশাসক এরশাদও একইভাবে সংবিধান সংশোধন করে। ২০০৬ সালে হাইকোর্ট এবং ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্ট জিয়া-এরশাদের সামরিক শাসন ও সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রথম থেকেই সামরিক শাসকদের অবৈধ সংবিধান সংশোধনীর বিরোধিতা করেছে। '৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ ছিল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০১০ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে '৭২-এর সংবিধানের মূল চেতনায় ফিরে যাওয়ার লক্ষ্যে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল সংসদে উত্থাপন করা হয়। ২১ জুলাই ২০১০ জাতীয় সংসদের সকল দলের সদস্য সমন্বয়ে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংবিধান সংশোধনী সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়। দীর্ঘ প্রায় এক বছর সংসদীয় কমিটি দেশের প্রতিষ্ঠিত প্রায় সকল রাজনৈতিক দল, সংবিধান বিশেষজ্ঞ, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, পেশাজীবী, সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংগঠন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে আলোচনা ও মতবিনিময় করে। অসংখ্য সংগঠন/প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি লিখিতভাবেও তাদের মতামত জানায়। সংসদীয় কমিটির ২৭টি সভায় এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ৩০ জুন ২০১১ জাতীয় সংসদে পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী বিল পাস হয়। এ সংশোধনীর ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংবলিত '৭২-এর সংবিধানের চার মূলনীতি সংবিধানে পুনঃসংযোজিত হয়। অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা দখলের পথ রুদ্ধ হয়।

- নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আর্থিক ক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিচার বিভাগের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে স্বতন্ত্র বেতন স্কেল।

- বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম মহামান্য রাষ্ট্রপতি সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সার্চ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে লোকবল নিয়োগ ও আর্থিক ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে।

- ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সংসদ উপ-নির্বাচন, সিটি করপোরেশন ও মেয়র নির্বাচনসহ ৫ হাজার ৮০৩টি স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচিত হয়েছে ৬৪ হাজার ২৩ জনপ্রতিনিধি। স্থানীয় সরকার এবং জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনসমূহে নিশ্চিত করা হয়েছে জনগণের ভোটাধিকার। প্রমাণিত হয়েছে আওয়ামী

লীগ সরকারের অধীনে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন সম্ভব।

- ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা পরিষদ ও পৌর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- গঠন করা হয়েছে কার্যকর স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন।
- সংবিধানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম-অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক অর্পিত সম্পত্তি আইন সংশোধন করা হয়েছে।
- প্রণয়ন করা হয়েছে তথ্য অধিকার আইন এবং গঠন করা হয়েছে তথ্য অধিকার কমিশন।
- বিএনপি-জামাত জোটের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ মদতে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নস্যাৎ ও জঙ্গিবাদের উত্থানের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকারের পাঁচ বছর জঙ্গিবাদীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছে। সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের কলঙ্ক তিলক মোচন করে বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জনপদ।
- প্রবাসী বাঙালিদের জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে ৩টি অনাবাসী ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে।
- দলীয়করণের উর্ধ্বে দক্ষ ও গণমুখী জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বহুমুখী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা-উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কম্পিউটার সরবরাহ এবং ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে সব নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স দুই বছর বাড়িয়ে ৫৯ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬০ বছর। ঘোষণা করা হয়েছে ২০ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা। সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি চার মাস থেকে বাড়িয়ে ছয় মাসে উন্নীত করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার রাজস্ব খাতে ৪ লাখ ২৭ হাজারের বেশি পদ সৃষ্টি করেছে এবং ১ লাখ ১৮ হাজারের বেশি পদ স্থায়ী করেছে। চাকরিরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে ২০ হাজার টাকার স্থলে ৫ লাখ টাকা এবং আহত হলে ২ লাখ টাকা অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট

সরকারি কর্মচারী আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।

- বেতন, ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ দেশের পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসমূহকে আধুনিক ও দক্ষ করে গড়ে তোলার বহু-মুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রংপুরে নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিভাগীয় শহর রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও গাজীপুরকে সিটি করপোরেশন ঘোষণা করে সেসব করপোরেশনের নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে। ময়মনসিংহকে সিটি করপোরেশনে উন্নীত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ভেতর দিয়ে গত পাঁচ বছরে যেসব পরিবর্তন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, এক কথায় তা অভূতপূর্ব।

- ২০১২ সালের মধ্যে খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের কথা সর্বজনবিদিত। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনা, কৃষি গবেষণা এবং কৃষির আধুনিকায়নে অর্জিত হয়েছে যুগান্তকারী সাফল্য। সারের দাম কয়েক দফা হ্রাস, কার্ডের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ বিতরণের ব্যবস্থা, মাত্র ১০ টাকায় কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগদান এবং বর্গাচাষিদের বিনা জামানতে কৃষি ঋণ প্রদান প্রভৃতি পদক্ষেপের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। ধান ছাড়াও শাক-সবজি, ফল-মূল, তেল, ভুট্টা ও মসলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। পাট ও পাঁচ শতাধিক ছত্রাকের জীবনরহস্য আবিষ্কার, পুষ্টি (ভিটামিন 'এ') সমৃদ্ধ উন্নত ধান বীজ উদ্ভাবন, লবণাক্ততা, খরা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য কৃষি পণ্যের হাইব্রিড জাত আবিষ্কার বাংলাদেশের কৃষিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে।
- একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরে শতভাগ শিশুর ভর্তি, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রতিবছর বিনামূল্যে বই বিতরণ, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষার প্রবর্তন, ঝরে পড়ার হার হ্রাস, ছাত্রীদের অনুপাত বৃদ্ধি এবং প্রাথমিকে ৭৮ লাখ ৭০ হাজার ১২৯ জন, মাধ্যমিক স্তরে ৪০ লাখ ও উচ্চ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ১ লাখ ৩৩ হাজার শিক্ষার্থীর সরকারি বৃত্তি পাওয়া প্রভৃতি শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী অগ্রগতির সাক্ষর। ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষকদের পদমর্যাদা, বেতন-ভাতা, ট্রেনিং ও দক্ষতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান, কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা, প্রতি উপজেলায় একটি করে বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে পরিণত করার কার্যক্রম চলছে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, ভর্তি পরীক্ষা, পরীক্ষার ফল প্রকাশ প্রভৃতি কার্যক্রম জনগণের প্রশংসা অর্জন করেছে। আওয়ামী লীগ সরকার ইতোমধ্যে ৬টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে, আরও ৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ৯টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ১ হাজার কোটি টাকার স্থায়ী তহবিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়ক ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। দেশে সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে।

- ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব। শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ ছাড়াও প্রশাসন, ব্যাংকিং, চিকিৎসাসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং গণযোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে। প্রতিটি ইউনিয়নে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশে এখন প্রায় ৩ কোটি ৮৬ লাখ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। মানুষ ব্যবহার করছে ১০ কোটি মোবাইল সিম। মোবাইলে থ্রি-জি চালু করা হয়েছে এবং অচিরেই ফোর-জি চালু হবে।
- স্বাস্থ্য খাতে বিশেষত শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে সাউথ সাউথ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে বর্তমানে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৩, মাতৃমৃত্যু হার প্রতি হাজারে ১৪৩ জন। MDG-তে নির্ধারিত ২০১৫ সালের এই লক্ষমাত্রা বাংলাদেশ ২০১৩ সালেই অর্জন করেছে। এ ছাড়া মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বেড়ে ৬৭.৭ বছরে উন্নীত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মোট ১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু ও ২৪টি নতুন সরকারি হাসপাতাল চালু হয়েছে। ১০০ শয্যার জেলা হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় এবং ২৫০ শয্যার হাসপাতাল ৫০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের শয্যা সংখ্যা ৩০ থেকে ৫০-এ উন্নীত হয়েছে। ৭টি সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে কলেজে উন্নীত, ১২টি নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং ৪টি নতুন হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে ১ হাজার ৩৫টি নতুন বেসরকারি

হাসপাতাল। টেলিমেডিসিন ও ইন্টারনেট সংযোগের ফলে ইউনিয়ন ও উপজেলা থেকে বিশেষায়িত হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসাসেবার সুযোগ সৃষ্টি ও বাড়ানো হচ্ছে। সরকারি হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হচ্ছে। সংক্রামক ব্যাধি নির্মূল ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ অগ্রগণ্য। বাংলাদেশ বর্তমানে ৯০টি দেশে ঔষধ রপ্তানি করছে। ডাক্তার ও নার্সসহ স্বাস্থ্য খাতে প্রায় ৩০ হাজার জনকে নিয়োগ দান করা হয়েছে।

- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৫টি বাড়িয়ে ৫০টি করেছে। রাজনীতিতে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিল ও উপজেলা পরিষদে এবং পৌরসভায় সংরক্ষিত নারী আসন এক-তৃতীয়াংশে উন্নীতকরণ এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা, স্পিকার ও সংসদ উপনেতা নারী। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে– সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, জেলা প্রশাসক, পুলিশের উচ্চপদ, সশস্ত্র বাহিনী ও জাতিসংঘ শান্তি মিশনে নারীর অংশগ্রহণ– নারীর ক্ষমতায়নের ক্রমোন্নয়নের উজ্জ্বল সাক্ষর। বাংলাদেশে নারী-পুরুষের সংখ্যানুপাত ৪৯.৫ ঃ ৫০.৫, যা কেবল জনমিতিক ভারসাম্যপূর্ণ নয়ই, পৃথিবীতে বিরল এই অনুপাত নারী-শিশুর প্রতি সমাজের সমতাপূর্ণ আচরণের প্রতিফলন।

- গত পাঁচ বছরে দেশি-বিদেশি প্রায় ৬ হাজার বড় শিল্প প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে। এতে প্রায় ১৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। খুলনা ও সিরাজগঞ্জে দুটি বন্ধ পাটকল পুনরায় চালু করা হয়েছে। পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। সুষম শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত শিল্প এলাকা গড়ে তোলা হচ্ছে। স্থাপিত হয়েছে লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প।

- জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ফলে গত দুই বছর চাল আমদানি করতে হয়নি। গ্রামীণ হতদরিদ্রদের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাধীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে টেস্ট রিলিফ, ভিজিএফ, কাবিখা এবং স্বল্পমূল্যে ও বিনামূল্যে নিয়মিত খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। ফলে মঙ্গা হয়নি। না খেয়ে কেউ মারা যায় নি। আপদকালীন সময়ের জন্য খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা ১৪ থেকে ১৯ লাখ টনে উন্নীত করা হয়েছে।

- প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য ও বনাঞ্চল রক্ষা, পানিসম্পদের উন্নয়ন, নৌপথের নাব্যতা রক্ষা এবং সেচ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে বহুমুখী পদক্ষেপ। ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে মধুমতি, গড়াই, যমুনা, বুড়িগঙ্গা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীর দীর্ঘ নৌ-পথসমূহের নাব্যতা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। মধুমতি ও গড়াই নদী খননের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় লবণাক্ততা হ্রাস, সুন্দরবন এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা সম্ভব হচ্ছে। উপকূলীয় বাঁধ সংরক্ষণ, মজবুতকরণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশের অন্যতম হিসেবে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলা এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গ্রহণ করা হয়েছে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা-২০০৯। সরকার নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে। বাস্তবায়িত হচ্ছে বহুমুখী কর্মসূচি।

- যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে সড়ক, রেল ও নৌ-পথের সম্প্রসারণ ও সংস্কারের বিপুল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং চলমান রয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কের চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ এগিয়ে চলছে। মহসড়কগুলোর নিয়মিত সংস্কার করা হচ্ছে। তিস্তা সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় সরকারের অধীনে গত পাঁচ বছরে নির্মাণ করা হয়েছে ২৯ হাজার ৬৭২ কিলোমিটার সড়ক এবং ১ লাখ ৬৩ হাজার ৫৯৬ মিটার ব্রিজ ও কালভার্ট। বিআরটিসির বহরে ৯৫৮টি নতুন বাস সংযোজিত হয়েছে। রেল মন্ত্রণালয় আলাদা করা হয়েছে। কমিউটার রেল চালু, ২২ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণসহ রেলপথের আধুনিকায়ন চলছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- কক্সবাজারে সম্প্রসারিত আধুনিক বিমানবন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ বিমানের বহরে নতুন বোয়িং বিমান সংযোজন করা হয়েছে।

- রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরের যানজট নিরসনে ইতোমধ্যে ছোট-বড় বহুসংখ্যক উড়ালপথ বা ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে মেট্রোরেল নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ চলছে। আরও অনেক ফ্লাইওভার নির্মাণাধীন রয়েছে।

- হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা মহানগরীর একটি অংশ বিশ্বের

সেরা শহরগুলোর মতো আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন রূপ ধারণ করেছে। এ প্রকল্প এবং নবনির্মিত ফ্লাইওভার নেটওয়ার্ক ঢাকা-কে বিশ্বমানের আধুনিক নগর স্থাপত্যের মর্যাদা দান করেছে।

- বিভিন্ন শিল্পে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, তাদের প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন বন্ধ করে আনন্দময় শৈশব নিশ্চিত করতে আইনি ব্যবস্থাসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

- প্রতিবন্ধীদের বিশেষ করে অটিস্টিক শিশু-কিশোরদের কল্যাণে অটিজম ট্রাস্ট গঠনসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়াও তার বিশেষজ্ঞ কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে এবং জাতিসংঘেও অটিজমের ব্যাপারে বিশ্ব পরিসরে সচেতনতা সৃষ্টি ও কল্যাণমূলক প্রস্তাব পাস হয়েছে।

- শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণে সংশোধিত শ্রমনীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দুই দফায় ১৬০০ থেকে ৫৩০০ টাকা পুনর্নির্ধারণের ফলে ২০১০ সালের পরে মজুরি বেড়েছে ৩৭০০ টাকা।

- অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা ৯০০ থেকে ৩০০০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাদের জন্য আবাসন প্রকল্প ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আয়বর্ধক ভবন ও বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় স্তম্ভের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। সম্মুখ সমরের ১৩টি স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কয়েক দফায় তাদের বিশেষ 'সম্মাননা' জানানো হয়েছে।

- অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন জনগণের তথ্য জানার সুযোগ নিশ্চিত করেছে। সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বেসরকারি খাতে আরও বেশ কিছু টেলিভিশন চ্যানেল ও এফএম রেডিও-র অনুমতি দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় ভিত্তিতে বহুসংখ্যক কমিউনিটি রেডিও চালু করা হয়েছে। সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অষ্টম ওয়েজ বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

- দেশের শিশু-কিশোর যুবক ও যুব মহিলাদের ৬৪টি জেলায় এবং ৬টি সরকারি কলেজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় এবং পর্যায়ক্রমে উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ ও সংস্কারের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এই সময়কালে বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের আয়োজক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। ক্রিকেট, ভারোত্তলন, গলফ এবং হকিতে এশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

- বহুমুখী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের মুক্তধারাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী, নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার ৯০ বছর পূর্তি এবং কবির ১১৩তম জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। জাতীয় জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত সর্বাধুনিক গ্যালারি নির্মাণ, বাংলা একাডেমিতে লেখক জাদুঘর, বাংলা একাডেমির উদ্যোগে বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম চালু এবং ক্ষুদ্র নৃ-জাতি গোষ্ঠীর ঐতিহ্য সংরক্ষণের আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উয়ারী বটেশ্বর ও বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে প্রাচীন নগর সভ্যতা ও বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কার এবং দেশের অন্যান্য প্রত্ন এলাকাগুলোতে উৎখনন অব্যাহত আছে। পুরাকীর্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭৪ সালে প্রণীত জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে সশস্ত্র বাহিনীর পুনর্গঠন, উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নের জন্য ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় সশস্ত্র বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংযোজন, পরিবর্ধন এবং আধুনিকায়নের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন ফর্মেশন, ইউনিট ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাসহ তিন বাহিনীর জনবল, গুণগত মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

  সেনাবাহিনীতে সিলেট অঞ্চলের প্রতিরক্ষার জন্য নতুন একটি পদাতিক ডিভিশন ও একটি কম্পোজিট ব্রিগেড প্রতিষ্ঠাসহ বহু ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ ও সমরশক্তি বৃদ্ধির জন্য নতুন প্রজন্মের ট্যাংক, সেলফ প্রপেলড গান, আধুনিক ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র, অত্যাধুনিক হেলিকপ্টার, লোকেটিং রাডার সংযোজন করা হয়েছে। আধুনিক এপিসি এবং অন্যান্য আর্মড যানবাহনের সমন্বয়ে একটি ম্যাকানাইজড পদাতিক ব্রিগেড প্রতিষ্ঠাসহ আরও বহু উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সেনাবাহিনীর সমরশক্তি ও চলাচলের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং যোগাযোগ সরঞ্জামাদি সংযোজন অব্যাহত রয়েছে।

নৌবাহিনীর শক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিকায়নের জন্য বিদেশ থেকে নতুন যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমাদের নিজস্ব শিপইয়ার্ডে তৈরি যুদ্ধ জাহাজও সংযোজন করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট ও হেলিকপ্টার সংযোজন করা হয়েছে। সাবমেরিন সংযোজনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন নেভাল কমান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পটুয়াখালীতে একটি পূর্ণাঙ্গ নৌ ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলছে।

বিমান বাহিনীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে বিমান বাহিনীতে প্রথমবারের মতো ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রসহ সংযোজিত হয়েছে সর্বাধুনিক সরঞ্জাম। অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান ও হেলিকপ্টার সংযোজন এবং যুদ্ধ বিমানসহ বিভিন্ন সরঞ্জামের সুষ্ঠু ও সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বঙ্গবন্ধু অ্যারোনটিক্যাল সেন্টার স্থাপন আওয়ামী লীগ সরকারের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কল্যাণের জন্য বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রেশনের মান বৃদ্ধি, নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সন্তানদের শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ বৃদ্ধিসহ বহু কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। সমুদ্রসীমা নিয়ে মিয়ানমারের সঙ্গে বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান– যা সমুদ্র বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত– বাংলাদেশ তার ভূ-খণ্ডের ৭৫ শতাংশের সমান ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রসীমায় সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে। ভারত, মিয়ানমার, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকাসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক সুদৃঢ় এবং দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত হয়েছে। ভারতের সঙ্গে স্থল সীমান্ত চিহ্নিতকরণ ও ছিটমহল হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারত, ভুটান ও নেপালের সাথে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও অভিন্ন নদীর অববাহিকাভিত্তিক যৌথ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বন্ধ এবং রোহিঙ্গাদের স্বদেশ

প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে দ্বি-পাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন কূটনৈতিক উদ্যোগ অব্যাহত আছে। আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে বহুমুখীকরণের উদ্যোগের অংশ হিসেবে সার্ক, বিমসটেক, ডি-৮, আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (এআরএফ), এশিয়া কো-অপারেশন ডায়ালগ (এসিডি), এশিয়া ইউরোপ মিটিং (আসেম)-সহ গুরুত্বপূর্ণ সকল ফোরামে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। ভারত মহাসাগরে বাংলাদেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে ইন্ডিয়ান ওশান রিম এসোসিয়েশন (আইওআরএ)-এ পালন করা হচ্ছে সক্রিয় ভূমিকা। বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মিয়ানমারের (বিসিআইএম) অর্থনৈতিক করিডোরের বিভিন্ন উদ্যোগে বাংলাদেশও সামিল রয়েছে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ঢাকায় বিমসটেক-এর হেড কোয়ার্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মুসলিম উম্মাহ্‌র সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি, অভিবাসী ও প্রবাসীদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আওয়ামী লীগ সরকার বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে। কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী, জঙ্গিবাদী ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড ব্যবহার করতে না দেওয়ার নীতি দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেছে।

জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকা, অবদান ও প্রস্তাব প্রশংসিত হয়েছে। জাতিসংঘ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শান্তি ও সমৃদ্ধির মডেল গ্রহণ করেছে।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০, ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার-২০১০, সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড-২০১১, ইউনেস্কো কালচারাল ডাইভার্সিটি পদক-২০১২, এফএও ডিপ্লোমা অ্যাওয়ার্ড-২০১৩ এবং সাউথ সাউথ কো-অপারেশন অ্যাওয়ার্ড-২০১৩-তে ভূষিত হয়েছেন।

বিরোধী দলের অসহযোগিতা, ধ্বংস ও সংঘাতের রাজনীতি

বিএনপি-জামাত জোট ২০০৮ সালের নির্বাচনের গণরায় মেনে নিতে পারেনি। প্রথম থেকেই তারা অসহযোগিতা, ষড়যন্ত্র ও সংঘাতের পথ গ্রহণ করে। বিডিআর বিদ্রোহকে ব্যবহার করে সেনাবাহিনীকে উসকানি প্রদান এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নস্যাতের জন্য বিএনপি নেতৃত্ব জামাতে ইসলামীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে একাধিক ব্যর্থ প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হওয়ার পর থেকেই বিএনপি নেতৃ

ত্ব যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষায় মরিয়া প্রচেষ্টা নেয়। তারা সারাদেশে হত্যা, গণহত্যা, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি, হেফাজতে ইসলামকে মাঠে নামানো, মসজিদে অগ্নিসংযোগ, হাজার হাজার কোরআন শরীফে অগ্নিসংযোগ এবং পুলিশ, সেনা সদস্য ও বিজিবি সদস্যদের হত্যাসহ সাধারণ নাগরিকদের পুড়িয়ে মারার মতো নারকীয় তাণ্ডবের সৃষ্টি করে। '৭১-এর মতোই জামাত-শিবিরের ঘাতক বাহিনী বিএনপিকে নিয়ে দেশবাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেতন-ভাতা সুযোগ-সুবিধা নিলেও ক্রমাগত সংসদ বর্জন এবং সংবিধান সংশোধনে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করে তারা সারাদেশে অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। নির্বাচন-কালীন সরকারের প্রশ্নে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রীর টেলিফোন এবং সংলাপের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান রাজনৈতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ রুদ্ধ করে দেয়।

নির্বাচনকালীন আন্তর্বর্তী সর্বদলীয় সরকার সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বিএনপি-জামাত জোট উপর্যুপরি হরতালের নামে এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং জামাতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিলের প্রেক্ষিতে বিএনপিই এখন জামাতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সংবিধানকে যেমন অস্বীকার করছে, তেমনি গত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে উন্নয়নের ধারা সূচনা করেছে তা বানচালের জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছে। বাংলাদেশকে তারা সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী তালেবানি রাষ্ট্রে পরিণত করতে এবং মধ্যযুগীয় অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নিতে চাইছে।

সংবিধান অনুযায়ী একটি অবাধ শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই এ দেশের মানুষ এই অপশক্তির সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবে। বাংলাদেশের মানুষ এ দেশকে সন্ত্রাসী-জঙ্গিবাদী দেশে পরিণত হতে দেবে না।

২০০৮ সালের নির্বাচনের গণরায় নিয়ে ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি সরকার গঠনের পর গত পাঁচ বছর বঙ্গবন্ধু-কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে যে পথ রচনা করেছে, সে পথেই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হবে। ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত রূপকল্প বাস্তবায়নের কাজ আমরা শুরু করেছি। অনেক ওয়াদা পুরণ করেছি। অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে; আরও অনেক উন্নয়ণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। বাংলাদেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত একটি সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এ কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই আমরা ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালন করতে চাই।

আমাদের দৃষ্টি ২০২১ সাল ছাড়িয়ে আরও সামনের দিকে, ২০৫০ সালের দিকে প্রসারিত; যখন বাংলাদেশ বিশ্বসভায় একটি উন্নত সুসভ্য দেশ হিসেবে আপন মহিমায় সমাসীন হবে। আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের সেই স্বপ্ন রূপায়ণের লক্ষ্যেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে করণীয়-কর্তব্য, অঙ্গীকার ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে।

শান্তি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জাতীয় সনদ

অতীতের পুঞ্জিভূত সমস্যা-সংকট, ষড়যন্ত্র ও নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে ২০০৯ সাল থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মহাসড়কে উঠে এসেছে। এই পথ ধরেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। দেশবাসী সংঘাত নয় শান্তি চায়। তারা অসাংবিধানিক পথে বা স্বৈরশাসনে ফিরে যেতে চায় না। তারা চায় সহিষ্ণু গণতন্ত্রের আলোকোজ্জ্বল অভিযাত্রা অব্যাহত রাখতে। দেশবাসী চায় স্থিতিশীল উন্নয়ন এবং নতুন প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, কর্মচঞ্চল, সুখী সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণ সর্বোপরি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রত্যয়ে আমরা জাতীয় সনদ ও 'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' কর্মসূচি ঘোষণা করছি।

আমাদের লক্ষ্য ও ঘোষণা

- আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের আর্থ-সামাজিক মুক্তি এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত যে উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা হবে। ২০০৮-১৩ সময়কালে গৃহীত যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি এবং প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত বা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, নির্ধারিত সময়ে সেসব কর্মসূচি ও প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হবে। যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণীত, অনুমোদিত এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের সিদ্ধান্ত হয়েছে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেগুলো বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়িত করা। এ জন্য প্রণীত হয়েছে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১। আমাদের বর্তমান নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪-এর সঙ্গে এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা পুনর্মূল্যায়ন এবং

সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে। ২০১৫ সালের মধ্যে বর্তমান ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালের মধ্যে মাথাপ্রতি গড় আয় বর্তমানের ১০৪৪ ডলার থেকে বেড়ে প্রায় ১৫০০ ডলারে উন্নীত হবে। প্রবৃদ্ধির হার বর্তমান ৬.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ১০ শতাংশ এবং দারিদ্র্য হার বর্তমান ২৬ শতাংশ থেকে কমে হবে ১৩.০০ শতাংশ। বিদ্যুৎ উৎপাদন বর্তমান ১০ হাজার মেগাওয়াট থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২৪ হাজার মেগাওয়াট। শিল্পায়নের ফলে শিল্পে জাতীয় আয়ের হিস্যা ২৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪০ শতাংশে এবং শ্রমশক্তি ১৫ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত হবে। আমাদের আশু লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে প্রকৃতই একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা।

আমাদের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে বিশ্বের প্রথমসারির উন্নত দেশগুলোর সমপর্যায়ে উন্নীত করা। এ লক্ষ্যে আমরা একটি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশলের (Development Strategy) রূপরেখা প্রণয়ন করব। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের পর এই দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কয়েক ধাপে সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলো প্রণয়ন করা হবে।

- আমাদের সকল কাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি শান্তিপূর্ণ এবং হিংসা, হানাহানি, শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্যমুক্ত ন্যায় ও সমতাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলা। আজকের শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের ভিত্তি রচনাই আমাদের একমাত্র ব্রত।

আমাদের এবারের অগ্রাধিকার : সুশাসন, গণতন্ত্রায়ন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন

১.১ শান্তি-স্থিতিশীলতা : জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা দূর করে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা হবে। নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান, তাদের কাজের ও চলাফেরার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

১.২ সংবিধান ও সংসদ : সংবিধান সুরক্ষা, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। সংসদকে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংসদের ভেতরে এবং বাইরে সংসদ সদস্যদের সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ বিধি-বিধান করা হবে।

১.৩ জাতীয় ঐকমত্য : গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমুন্নত এবং নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন নিশ্চিত করার মতো মৌলিক প্রশ্নে সব রাজনৈতিক দল, শ্রেণি ও পেশাজীবী সংগঠন এবং সিভিল সমাজসহ দলমত নির্বিশেষে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১.৪ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার : সাম্প্রদায়িকতা-জঙ্গিবাদ : যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন এবং শাস্তি কার্যকর করা হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করতে গিয়ে আন্দোলনের নামে হত্যা, সন্ত্রাস, পবিত্র কোরআন শরীফে অগ্নিসংযোগ, শিল্প-কারখানায় অগ্নিসংযোগ, রেলওয়ের ফিশ প্লেট উপড়ে ফেলা, সড়ক কাটাসহ রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পদের ধ্বংস সাধন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, উপাসনালয় ধ্বংস, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও বৃক্ষ নিধনের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের বিচার করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প-কারখানাসহ অর্থনীতির পুনর্বাসন, ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদান এবং নাশকতার ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সকল নাগরিকের স্ব স্ব ধর্ম পালনের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। ধর্ম, বর্ণ, নৃ-পরিচয়, লিঙ্গ এবং সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে, রাষ্ট্রের চোখে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

১.৫ বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন : বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা সংহত করা হবে। সর্বস্তরে জনগণের বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য এবং মামলাজট মুক্ত করে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে বিচার সম্পন্ন করার জন্য গৃহীত প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারসহ বিচার বিভাগের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির বাস্তবায়নাধীন ব্যবস্থা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। সবার জন্য আইনের সমান প্রয়োগ, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম জোরদার করা হবে। ন্যায়পাল নিয়োগ ও স্বাধীন মানবাধিকার কমিশনকে আরও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে।

১.৬ নির্বাচন ব্যবস্থা : ইতোমধ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য স্থায়ী নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলার যে সূচনা হয়েছে তা সংহত এবং শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে। নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্তিশালী, দক্ষ এবং স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী করা হবে। যুগের প্রয়োজনে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার অব্যাহত থাকবে।

১.৭ ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন : রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের ক্ষমতায়ন ও অধিকতর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। বর্তমান কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামোর গণতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের কাছে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা, অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি স্তর বিন্যাসের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হবে। সর্বস্তরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অধিকতর ক্ষমতাশালী ও দায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা হবে। প্রশাসনিক সংস্কার এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্সকে সম্প্রসারিত করা হবে।

১.৮ দুর্নীতি প্রতিরোধ : দুর্নীতি প্রতিরোধে, আইনি, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ জোরদার করা হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো হবে। ঘুষ, অনোপার্জিত আয়, কালো টাকা, চাঁদাবাজি, ঋণখেলাপি, টেন্ডারবাজি ও পেশিশক্তি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নিজেদের সম্পদ, আয়-রোজগার সম্পর্কে সর্বস্তরের নাগরিকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

১.৯ পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী : জনগণের নিরাপত্তা, শিল্পে শান্তি, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, পণ্য পরিবহন ও আমদানি-রপ্তানিকে নির্বিঘ্ন করা এবং চাঁদাবাজি-সন্ত্রাস কঠোর হস্তে দমনের লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সকল শাখাকে অধিকতর শক্তিশালী, দক্ষ এবং আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আরও উন্নত করা হবে। পুলিশ ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখা হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, পরিবারের সদস্যদের আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা হবে। পুলিশ প্রশাসনেরও প্রতিসংক্রমের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, দ্রব্যমূল্য ও সামষ্টিক অর্থনীতি

২.১ জনগণের জীবনযাত্রার ক্রমাগত মানোন্নয়ন, তাদের আয়-রোজগার বৃদ্ধি এবং খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে

স্থিতিশীল রাখা হবে। দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা, খাদ্য সংশ্লিষ্ট ভোগ্যপণ্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। বাজার ব্যবস্থার সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। 'ভোক্তা অধিকার'কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হবে এবং ভোক্তাদের সহায়তায় ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট মোকাবিলা করা হবে। বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির যে কোনো প্রচেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

২.২ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য দৃঢ় করা হবে। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করা হবে। শুল্ক-কর নীতি হবে ব্যবসায়বান্ধব। সরকারের ঘাটতি ব্যয় পরিমিত পর্যায়ে রাখা হবে। মুদ্রাবিনিময় নীতি হবে নমনীয়। বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য বজায় রাখা হবে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখবে। সরকারি সূত্রে যে কোনো সংগ্রহ উদ্যোগে পূর্ণ খরচ আদায়ের রীতি অনুসরণ করা হবে এবং ভর্তুকি হবে জনগণের কষ্ট নিরসন ও বিশেষ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে।

আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি

শিল্পায়ন

৩.১ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিল্প-সভ্যতার ভিত্তি রচনার জন্য দেশি-বিদেশি এবং প্রবাসী বাঙালি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এ জন্য ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা নিরসনের লক্ষ্যে আইন ও বিধি সহজ করা, ওয়ানস্টপ সার্ভিস কার্যকর করা, কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমন, বিনিয়োগবান্ধব রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি, অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণ, একই সঙ্গে রপ্তানি পণ্য বহুমুখী করা এবং বিনিয়োগকারীদের যুক্তিসম্মত রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান হবে শিল্পায়নের কৌশল। এ জন্য প্রণীত সমন্বিত শিল্পনীতি ও কৌশলপত্র ভবিষ্যতে আরও সময়োপযোগী করা হবে।

৩.২ খাদ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, জাহাজ নির্মাণ, হাল্কা প্রকৌশল, ঔষধ, প্লাস্টিক, খেলনা, গৃহস্থালি সহায়ক সামগ্রী, আইটি, চামড়া ও রাসায়নিক শিল্পের মতো সম্ভাবনাময় শিল্প চিহ্নিত করে আগ্রহী ও দক্ষ শিল্প উদ্যোক্তাদের শুল্ক-কর ও আর্থিক (Fiscal/Financial) সহায়তা দেওয়া হবে। পাট

শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকায়নের ধারা বেগবান করা হবে। পাটের জন্মরহস্য আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে পাটের বিকল্প ব্যবহারের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হবে। পোশাক ও টেক্সটাইল শিল্পকে আরও শক্তিশালী, নিরাপদ এবং প্রতিযোগিতা সক্ষম করা হবে।

৩.৩ বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা ও শিল্পাঞ্চল স্থাপনের প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। মফস্বল ও প্রান্তিক এলাকায় কৃষিনির্ভর এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পাঞ্চল স্থাপন এবং বিদ্যমান ইপিজেডগুলোতে শিল্পায়নের সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে। কম উন্নত এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ এবং রাজস্ব ও আর্থিক সহায়তা প্রদানে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৩.৪ শ্রমঘন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ ও পুনঃঅর্থায়নের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা ও অন্যান্য সহায়তা অব্যাহত রাখা এবং সম্প্রসারিত করা হবে। যারা শুল্ক-কর ও ব্যাংক ঋণ নিয়মমাফিক পরিশোধ করেছেন এবং পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন তাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সহায়তা দেওয়া হবে।

৩.৫ ঐতিহ্যবাহী তাঁত, তামা, কাসা ও মৃৎশিল্পসহ গ্রামীণ শিল্পকে বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বিকাশ, বাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধি উৎসাহিত করা হবে। জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি, প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের লাভজনক ও উৎপাদনশীল বিনিয়োগ, পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণকে সর্বতোভাবে সহায়তা দেওয়া হবে। অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি পণ্যের নির্বিঘ্ন পরিবহন ও চলাচল নিশ্চিত করতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

৪.১ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত ও আরও দ্রুততর করা হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে আওয়ামী লীগ সরকার প্রণীত এবং বাস্তবায়নাধীন মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের ভেতর দিয়ে আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশের প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। ২০১৬ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হবে। ২০২১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০ হাজার মেগাওয়াট; কিন্তু

শিল্পায়ন ও ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সক্ষমতার প্রেক্ষিতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়েছে। বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি প্রতিবেশী ভারত, ভুটান ও নেপালের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন-বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পরিকল্পিত ৩০ লাখ সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার সহজলভ্য ও ব্যাপক করা হবে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে। কয়লাসম্পদের যথাযথ অর্থনৈতিক ব্যবহারের লক্ষ্য হবে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ১৩০০ মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ইতোমধ্যে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা আমদানি করা হবে। ২০৩০ সালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের হিস্যা হবে প্রায় ৫০ শতাংশ।

৪.২ গ্যাসের যুক্তিসঙ্গত উত্তোলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে আরও শক্তিশালী করার নীতি অব্যাহত থাকবে। গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান এবং উত্তোলনে বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও রিগ এবং আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি সংগ্রহ করা হবে। নতুন গ্যাস ও তেলক্ষেত্র আবিষ্কারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বাংলাদেশের উপকূল ও গভীর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে অন্যান্য দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে। দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের অবশিষ্ট জেলাগুলোয় গ্যাস সরবরাহের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপচয় হ্রাসের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। গ্যাসের মজুদ সীমিত বিধায় ইতোমধ্যে বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানির যে প্রক্রিয়া চলছে তা সম্পন্ন করা হবে এবং এজন্য মহেষখালি দ্বীপে এলএনজি টার্মিনালসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

৫.১ দারিদ্র্য নিরসনে আওয়ামী লীগ সরকারের গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকবে। দারিদ্র্যের লজ্জা ঘুচিয়ে একটি ক্ষুধামুক্ত মানবিক সমাজ নির্মাণে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। আওয়ামী লীগের দারিদ্র্য বিমোচন

কৌশলের লক্ষ্য ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অনুপাত ১৫ শতাংশেরও নিচে অর্থাৎ ১৩ শতাংশে নামিয়ে আনা। ইতোমধ্যে বার্ষিক দারিদ্র্য হ্রাসের হার নির্ধারিত ১.৭ থেকে ২.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। নির্ধারিত হার ছাড়িয়ে অর্জিত হার বজায় থাকলে ২০২১ সালের আগেই, অর্থাৎ আগামী পাঁচ বছরেই দারিদ্র্যের অনুপাত ১৫ শতাংশে নেমে আসবে। বৈষম্য দুরীকরণে বর্তমান অগ্রগতির ধারা বজায় থাকবে।

৬.১ সামাজিক নিরাপত্তা : দারিদ্র্য হ্রাসে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্জিত গতিশীলতা এবং হত-দরিদ্রদের জন্য টেকসই নিরাপত্তা বেষ্টনির যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা আরও জোরদার করা হবে। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্ভাবিত– একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রায়ণ, গৃহায়ন, আদর্শ গ্রাম, গুচ্ছ গ্রাম, ঘরে ফেরা প্রভৃতি কর্মসূচি ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। এসব কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। এ ছাড়া বয়স্ক ভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা অব্যাহত থাকবে। দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের কর্মসূচি গ্রাম পর্যায়ে বৃদ্ধি করা হবে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা এবং সেই সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক স্থাপন করা হবে।

দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিশেষ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। একটি সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কাঠামোর আওতায় গৃহীত কর্মসূচিগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে, যাতে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন অধিকতর ফলপ্রসূ ও দ্রুততর হয়।

৬.২ বর্তমান অভিজ্ঞতার নিরিখে বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে পেনশন ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ শুরু হবে ২০১৮ সালে। এবং ২০২১ সালে সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হবে।

কর্মসংস্থান

৭.১ আওয়ামী লীগের কর্মসংস্থান নীতির মূল লক্ষ্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে আধাদক্ষ ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে– (ক) মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়

জোরদার করা হবে। (খ) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্ত কাজকে গতিশীল করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। (গ) মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প খাত উৎসাহিত করা হবে। (ঘ) প্রশিক্ষিত যুবক, যুব মহিলাদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। (ঙ) দুই বছরের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রচলিত 'ন্যাশনাল সার্ভিস' কর্মসূচিকে পর্যায়ক্রমে সকল জেলায় সম্প্রসারিত করা হবে। (চ) কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি করা হবে। (ছ) কৃষি ও সেবা খাতে কর্মসংস্থানের বিদ্যমান সুযোগ আরও সম্প্রসারিত করা হবে এবং ব্যাপক সামাজিক কর্মসংস্থান প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। এজন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন, বৃত্তি এবং পেশা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকে সমন্বিত ও প্রসারিত করা হবে। ২০২১ সাল নাগাদ কর্মক্ষম সব বেকার ও প্রচ্ছন্ন বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৭.২ অর্থনীতিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় আয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অবদান ৩০ শতাংশ; ৪৫ শতাংশ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। কুটির শিল্প, তাঁত, রিকশা/ভ্যান প্রভৃতি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি উপকরণ ও প্রযুক্তি সরবরাহ এবং শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে আরও গতিশীল ও উৎপাদনশীল করা হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক খাতের সঙ্গে সম্পর্ক গভীরতর করা হবে।

কৃষি, খাদ্য, ভূমি ও পল্লী উন্নয়ন

৮.১ জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ধারাকে সুসংহত করা হবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বিবেচনায় রেখে দেশবাসীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বাংলাদেশকে খাদ্যে উদ্বৃত্ততা করা, আপদকালীন নির্ভরযোগ্য মজুদ গড়ে তোলার পাশাপাশি রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করাই হবে কৃষি উন্নয়নের মূল লক্ষ্য। এজন্য সার, বীজ, সেচসহ কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান, রেয়াতি সুদে প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ সরবরাহ এবং উৎপাদক কৃষক পর্যায়ে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে বর্গাচাষিদের জামানত ছাড়া কৃষি ঋণ প্রদান অব্যাহত থাকবে। কার্ডের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ বিতরণ ও ভর্তুকি প্রদানে অনিয়ম-দুর্নীতিমুক্ত যে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা গড়ে উঠেছে তা অব্যাহত রাখা হবে। সেচ সুবিধা বৃদ্ধি এবং ভূ-উপরস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার বাড়ানোর নীতি অব্যাহত থাকবে।

ধান ছাড়াও গম, ভুট্টা, শাক-সবজি, তেল বীজ, মসলা, ফল-মূল প্রভৃতি ফসল এবং ফুল, লতা-পাতা-গুল্ম উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনা এবং সম্ভাব্য সব খাতে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের প্রয়াস আরও জোরদার করা হবে। ভোজ্য তেল উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের চাহিদা মেটানো হবে।

মাছ, দুধ, ডিম, মুরগি, গবাদি পশু ও লবণের বাণিজ্যিক উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির ব্যাপারে উৎপাদক পর্যায়ে রাজস্ব ও আর্থিক সুবিধা দেওয়া হবে। কৃষিপণ্যভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দেওয়া হবে। চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একদিকে উচ্চফলনশীল জাতের আখ উদ্ভাবন এবং একরপ্রতি ফলন বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হবে; অন্যদিকে বিট চাষ প্রসারে জোর দেওয়া হবে। চিনিকলগুলোর আধুনিকায়ন, অপচয় ও দুর্নীতি বন্ধ এবং চিনিকলসমূহে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টি করে সংবৎসর চালু রাখার মাধ্যমে চিনির উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও লাভজনক করা হবে।

কৃষি গবেষণাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। পাটের মতো অনাবিষ্কৃত অন্যান্য অর্থকরী ফসলের জীবনরহস্য আবিষ্কার এবং খরা, লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের সূচিত ধারাকে আরও বেগবান করা হবে। জৈবপ্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উদ্ভাবন ও ব্যবহারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৮.২ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় খাদ্য ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ক্রমাগত বাড়ানোর নীতি অব্যাহত থাকবে। কেবল পরিমাণগত নয়, প্রতিটি মানুষের পুষ্টিমানসম্মত সুষম খাদ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে। কৃষি উৎপাদনে যাতে মন্দাভাব ও নিরুৎসাহ দেখা না দেয়, সে জন্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের জন্য প্রণোদনামূলক মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয় এবং পর্যাপ্ত মজুদ গড়ে তোলার নীতি-পরিকল্পনা অব্যাহত থাকবে।

৮.৩ খাদ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো বন্ধের উদ্দেশ্যে প্রণীত 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করা হবে। দেশবাসীর জন্য ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যমুক্ত নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা হবে।

৮.৪ শিল্পায়ন, আবাসন ও ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে আবাদযোগ্য ভূমি ও জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাসের উদ্বেগজনক হার নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞানসম্মত ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি গ্রহণ করা হবে। আগামী পাঁচ বছরে দেশের সব জমির রেকর্ড ডিজিটালাইজড করার কাজ সম্পন্ন করা হবে। জমির সর্বোচ্চ যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। খাস জমি, জলাশয় এবং নদী ও সমুদ্র থেকে জেগে ওঠা

জমি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভূমিহীন ও বাস্তুভিটাহীন হত-দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

৮.৫ পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্য হবে, গ্রামাঞ্চলে কর্মসৃজন, গ্রামাঞ্চলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধার বিস্তৃতি সাধন এবং গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের হার কমিয়ে আনা। প্রতিটি ইউনিয়ন সদরকে পরিকল্পিত পল্লী জনপদ হিসেবে গড়ে তোলা হবে। আবাসন, শিক্ষা, কৃষিনির্ভর শিল্পের প্রসার, চিকিৎসাসেবা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্প কেন্দ্রগুলোকে আধুনিক শহর-উপশহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

শিক্ষা ও মানব উন্নয়ন

৯.১ আমাদের জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষা ও মানব উন্নয়ন পালন করবে নিয়ামক ভূমিকা। শিক্ষা খাতে ২০০৯-১৩ পর্বে অনুসৃত নীতি ও সাফল্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বর্তমান শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে।

৯.২ প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করা হবে এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হবে। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি অব্যাহত থাকবে। ইতোমধ্যে গঠিত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড থেকে স্নাতক পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত করা হবে। ভর্তির হার ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিনামূল্যে বই বিতরণ বাড়ানো হবে।

শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যে বয়স্কদের জন্য গৃহীত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

৯.৩ শিক্ষার মানোন্নয়নকে সর্বাধুনিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। এ জন্য প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত হ্রাস, প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি ও শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, সকল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি ও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর ব্যবহার সম্প্রসারিত করা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা অব্যাহতভাবে বাড়ানো হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের পৃথক বেতন স্কেল ও স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন করা হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়া রোধে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৯.৪ মানবসম্পদ উন্নয়ন আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকারের বিষয়। আমাদের

জনসংখ্যায় শিশু-কিশোরের প্রাধান্য বিবেচনায় এ কাজটি অতিরিক্ত গুরুত্ব দাবি করে। ইতোমধ্যে কতিপয় উন্নয়ন সহযোগীর সঙ্গে মিলে আমরা মানবসম্পদ উন্নয়নে একটি সার্বিক কৌশল গ্রহণ করেছি। এ কৌশলের অংশ হিসেবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং ব্যক্তি মালিকানা খাত ও সরকারি উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করা হবে। শিক্ষার বিষয়বস্তু বা কারিকুলামও চাহিদা অনুযায়ী বাস্তবানুগ করা হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা এবং বিভিন্ন পেশায় ও প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণের সুযোগ ঢেলে সাজানোর যে কাজ শুরু হয়েছে তা সুচারুভাবে সম্পন্ন করা এবং সারাদেশে এর প্রচলন নিশ্চিত করা হবে। এ ছাড়া, প্রত্যেক উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় ভোকেশনাল ট্রেনিং কোর্স প্রবর্তনের কর্মপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারিত করা হবে। প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে মডেল বিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। মূলধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কম্পিউটার ও অনার্স কোর্স চালুসহ যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে।

৯.৫ উচ্চশিক্ষার প্রসার এবং ভর্তি সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে, তা অব্যাহত থাকবে। বেসরকারি খাতে উপযুক্ত মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি প্রদানের নীতি অব্যাহত থাকবে। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চা উৎসাহিত করা হবে।

৯.৬ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, অপরাজনীতি, দলীয়করণ ও সেশনজট দূর করতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যবস্থাকে অধিকতর গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার পাশাপাশি শিক্ষকদের দলাদলির কারণে শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হতে পারে সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশগুলো পুনর্মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে।

স্কুল ও কলেজের পরিচালন ব্যবস্থাকেও দলীয়করণমুক্ত, অধিকতর গণতান্ত্রিক, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণমূলক, দায়িত্বশীল এবং স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা হবে।

বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি

১০.১ আমাদের দেশের বিপুল জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা, দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রেক্ষিতে কৃষি জমি ও জলাশয়ের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ প্রতিটি খাতে গবেষণা ও উন্নয়নকে (আরএনডি) সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, আবিষ্ক্রিয়া, প্রযুক্তি ও মানবজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে রাষ্ট্র ও সরকার বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি বিজ্ঞানী ও গবেষকদের বিশেষ মর্যাদা দান, তাদের চাকরির বয়সসীমা এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রণোদনা এমন পর্যায়ে আনা হবে যাতে তারা আরাধ্য গবেষণা সাফল্যের সঙ্গে শেষ করতে পারেন এবং নতুন নতুন আবিষ্কারে আত্মনিবেদন করতে পারেন।

১০.২ বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা এবং পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন ও হালনাগাদ করা হবে। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরে আইটি শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা, মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার এবং ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারিত করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন দ্রুততর করা হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও কম্পিউটার শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার করা হবে।

সফটওয়্যার শিল্পের প্রসার, আইটি সার্ভিসের বিকাশ, দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইসিটি ইনকুবেটর এবং কম্পিউটার ভিলেজ স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন এসব কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। একই সঙ্গে আউট সোর্সিং ও সফটওয়্যার রপ্তানি ক্ষেত্রে সকল প্রকারের সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

১০.৩ দেশজুড়ে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা যেমন থ্রি-জি চালু হয়েছে। ফোর-জি-ও চালু করা হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

১১.১ স্বাস্থ্যনীতি ও কর্মপরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা হবে। সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু আছে। কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শিশু ও মাতৃমঙ্গল এবং সন্তান প্রসবের নিরাপদ সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হবে। এজন্য প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রশিক্ষিত নার্স ও মহিলা ডাক্তার

নিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। মাতৃমৃত্যু হার ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা প্রতি হাজারে ১৪৩ জন অর্জন এবং আরও কমানোর কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও জোরদার করা হবে। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস রোগীদের রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও শিশুমৃত্যু হার আরও কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ২০২১ সালের মধ্যে গড় আয়ুষ্কাল ৭২ বছরে উন্নীত এবং জন্ম হার হ্রাসের লক্ষ্যে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতি কার্যকর করা হবে। মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের (ডাক্তার) উপস্থিতি নিশ্চিত করা, সেবার মান উন্নত এবং ঔষধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং ব্যবস্থা উন্নত করা হবে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে জেলা থেকে উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত করার উদ্যোগ ত্বরান্বিত করা হবে। টেলিমেডিসিন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা হবে।

১১.২ সকলের জন্য আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ সুপেয় পানি, প্রতি বাড়িতে স্যানিটেশন এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক ও ভেজালমুক্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

১১.৩ চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের সম্পৃক্ত করা হবে। চিকিৎসা ও চিকিৎসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বাড়ানো হবে। নার্সিং ও মেডিকেল টেকনোলজি শিক্ষার সম্প্রসারণ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ানো হবে।

১১.৪ ইউনানি, আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথিসহ দেশজ চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ভেষজ ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে।

১১.৫ সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ এবং উদ্বেগজনক হারে ক্রমবর্ধমান ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি অসংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস ও চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারণে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১১.৬ প্রতিবন্ধী কল্যাণে আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে। অটিস্টিক ও অন্য প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, পুষ্টি, মানসিক ও শারীরিক বিকাশ, কর্মসংস্থান, চলাফেরা এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিজ্ঞানসম্মত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা

১২.১ নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেবল সংখ্যাগত সাম্য প্রতিষ্ঠাই নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ানো হবে। প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে নারীর অধিক সংখ্যায় নিয়োগের নীতি অব্যাহত থাকবে।

১২.২ নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি, বৈষম্য বন্ধ এবং নারী ও শিশু পাচার রোধে গৃহীত আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

১২.৩ নারীর কর্মের স্বাধীনতা, কর্মক্ষেত্রে এবং চলাফেরায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। নারীকে গৃহবন্দী রাখার জন্য ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং নারী-বিদ্বেষী অপপ্রচার বন্ধে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের পাশাপাশি কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নারী শ্রমের মর্যাদা সুরক্ষা করা হবে। শিল্প-বাণিজ্য ও সেবা খাতে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রণোদনা, সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত ও বাড়ানো হবে।

শিশু-কিশোর ও তরুণ প্রজন্ম

১৩.১ শিশু-কিশোরদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষা, ক্রীড়া, বিনোদন ও সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সংরক্ষণ সনদ অনুসরণ এবং জাতীয় শিশুনীতি হালনাগাদ করা হবে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইতিহাস চেতনা, জ্ঞানস্পৃহা ও বিজ্ঞানমনস্কতা জাগিয়ে তুলতে এবং তাদের আনন্দময় শৈশব নিশ্চিত করতে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পোশাক শিল্পের মতো অন্যান্য শিল্প এবং অসংগঠিত খাতেও শিশুশ্রম পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করা হবে। শিশু নির্যাতন বিশেষ করে কন্যা শিশুদের প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা বন্ধ এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, তাদের নাশকতা ও সহিংসতার ঢাল হিসেবে ব্যবহার কঠোর হাতে দমন করা হবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বয়সে তরুণ। বাংলাদেশ প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা সৃজনশীল সাহসী তরুণ-তরুণীদের দেশ। তরুণ-তরুণীদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, তাদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ অবারিত করা এবং জাতীয় নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য আওয়ামী লীগ সম্ভাব্য সকল রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আওয়ামী লীগ নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের হাতে আগামী দিনের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্বভার ন্যস্ত করবে।

যোগাযোগ : সড়ক, রেলওয়ে, বিমান ও নৌ-পরিবহন

১৪.১ দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, পণ্য পরিবহন এবং যাত্রী পরিবহনের জন্য বিদ্যমান সড়ক ও জনপথ অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিদ্যমান সড়কের মেরামত, সংরক্ষণ, মানোন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং লেন সংখ্যা বাড়ানো হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে (ক) ইতোমধ্যে শুরু হওয়া পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা (খ) চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ (গ) ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে চার লেন নির্মাণ সমাপ্তকরণ এবং (ঘ) পটুয়াখালীতে দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর– পায়রা বন্দরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হবে। এ ছাড়া, ঢাকা-মংলা এবং ঢাকা-টাঙ্গাইল-বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে চার লেন নির্মাণের প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। দেশের বিদ্যমান সড়কপথগুলোর প্রশস্তকরণ এবং দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন সড়কপথ নির্মাণ করা হবে।

১৪.২ দ্বিতীয় যমুনা সেতু ও দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণের কারিগরি ও অন্যান্য প্রস্তুতি দ্রুত সম্পন্ন করে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ দুটি সেতুর নির্মাণকাজ শুরু করা হবে।

সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হবে।

১৪.৩ অধিকতর পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী বিবেচনায় বাংলাদেশ রেলওয়েকে ঢেলে সাজানো হবে। রেল খাতে বর্ধিত বিনিয়োগ অব্যাহত থাকবে। বিদ্যমান রেলপথ এবং কোচের সংস্কার, আধুনিকায়ন এবং যাত্রী ও মাল পরিবহনের ক্ষমতা বাড়ানো হবে। খুলনা-মংলা রেল সংযোগ, নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-গাজীপুর এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে লাইন সংখ্যা বাড়ানো হবে। ঢাকা-মংলা রেল সংযোগ, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা মহানগরীকে ঘিরে সার্কুলার রেলপথ নির্মাণ করা হবে। বাণিজ্যিক সক্ষমতার লক্ষ্যে দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করা হবে। রেলওয়েকে লাভজনক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৪.৪ বাংলাদেশ বিমানের যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিমানকে লোকসানি প্রতিষ্ঠান থেকে লাভজনক করার যে উদ্যোগ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার গ্রহণ করেছিল, তা আরও ফলপ্রসূ ও জোরদার করতে হবে। ইতোমধ্যে ৪টি বোয়িং সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রয়োজনে আরও বিমান সংগ্রহ, অপচয়, অদক্ষতা ও দুর্নীতি রোধ করে বিমানের সক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সামর্থ্য বাড়ানো হবে। ২০১৪ সাল থেকে ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইট চালু করা হবে।

ঢাকা ও কক্সবাজার বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। মংলা বিমানবন্দরের কাজ নতুন করে শুরু করা হবে।

ঢাকার অদূরে আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাবিত সর্বাধুনিক বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের চূড়ান্ত স্থান নির্ধারণ এবং নির্মাণকাজ শুরু করা হবে।

১৪.৫ নৌ-পরিবহনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নদীপথ খনন ও পুনর্খননের যে বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে, তা আরও জোরদার করা হবে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ক্রমশ ভরাট হয়ে যাওয়া নৌ-পথগুলো পুনরুদ্ধার ও খননের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি, নৌ চলাচলের উপযোগী করে তোলা হবে। প্রধান নদী ও নৌ-পথগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধি ছাড়াও ভরাট ও পরিত্যক্ত নৌ-পথগুলো ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নদী পুনরুজ্জীবনের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কাজ অব্যাহত থাকবে।

এজন্য প্রয়োজনীয় ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। মংলা বন্দরের জন্য নিজস্ব ড্রেজার ক্রয় করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে পণ্য পরিবহন ক্ষমতা বাড়ানো এবং নৌ-চ্যানেলগুলো নিয়মিত ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে যেভাবে নাব্য রাখা হচ্ছে, তা অব্যাহত থাকবে।

১৪.৬ সড়ক, রেল ও নৌ-পথে দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিরাপদ সড়ক গড়ে তোলার গৃহীত কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা হবে।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ

১৫.১ আমাদের দেশে মাদকাসক্তি উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। মাদকের প্রধান শিকার তরুণ সমাজ। সামগ্রিকভাবে আমাদের সমাজ ও তারুণ্যের শক্তিকে মাদক ও নেশার হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কঠোরতম হাতে মাদক ব্যবসা, মাদক চোরাচালান এবং ব্যবহার বন্ধ করা হবে। অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ঘোষিত তামাক ও তামাক-জাত বিড়ি-সিগারেট সেবনকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে তামাকের আবাদ ও বিড়ি-সিগারেটের উৎপাদন-বাজারজাতকরণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জুয়া ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

১৫.২ মাদকাসক্তদের চিকিৎসাসেবার সুযোগ বৃদ্ধি, তাদের পুনর্বাসন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং সামাজিক উদ্যোগ গড়ে তোলা হবে। মাদকদ্রব্য উৎপাদন, পাচার ও চোরাচালান বন্ধে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন : পরিবেশ ও পানিসম্পদ

১৬.১ বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহ অব্যাহত থাকবে এবং সম্প্রসারিত হবে। ২০০৯ সালে সরকারের গৃহীত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন এবং হালনাগাদ করা হবে। জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডে অর্থবরাদ্দ অব্যাহত থাকবে এবং আন্তর্জাতিক উৎস হতে সহায়তা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

১৬.২ বাংলাদেশে বিদ্যমান বন সংরক্ষণ, নতুন বন সৃজন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উপকূল ও চরাঞ্চলে টেকসই বনায়নের কর্মসূচিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং বাংলাদেশে পরিবেশের অধিকতর বিপর্যয় রোধ করার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত পদক্ষেপ ছাড়াও পানিসম্পদ রক্ষা, নদী খনন, নদীর ভাঙন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, লবণাক্ততা রোধ ও খরা মোকাবিলায় সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া জোরদার করা হবে। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, লবণাক্ততা রোধ, সুন্দরবনসহ অববাহিকা অঞ্চলে মিঠা পানির প্রবাহ বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৬.৩ বায়ু ও পানি দূষণ প্রতিরোধে বিশেষ করে শিল্প-বর্জ্য ও মহানগর ও নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করা হবে। ইতোমধ্যে গৃহীত প্রযুক্তিগত এবং আইনগত উদ্যোগের যথাযথভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রমিক ও প্রবাসী কল্যাণ

১৭.১ সংবিধানের ১৫, ২৮, ৩৮ ও ৪০ অনুচ্ছেদের আলোকে এবং আইএলও কনভেনশন অনুসরণে শ্রমনীতি ও শ্রমিক কল্যাণে বহুমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। জীবনধারণের ব্যয়, মূল্যস্ফীতি এবং প্রবৃদ্ধির হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। এ জন্য মজুরি কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের ভূমিকা বৃদ্ধি করা হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যবস্থার পাশাপাশি তাদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

১৭.২ পোশাক শিল্পের ন্যূনতম মজুরি কার্যকর এবং কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের

নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। শিল্পের নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। সকল শিল্প শ্রমিক, হত-দরিদ্র এবং গ্রামীণ কৃষি শ্রমিক এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য রেশনিং প্রথা চালু করা হবে।

১৭.৩ প্রবাসে কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী শ্রমজীবীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স আমাদের অর্থনীতির রক্ত সঞ্চালক উপাদান। বিভিন্ন দেশে আরও বেশি সংখ্যায় প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণ এবং তাদের শ্রমলব্ধ অর্থের আয়বর্ধক এবং লাভজনক বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত নীতি-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে নমনীয় শর্তে ও সুদে বিদেশে যাওয়ার জন্য এবং দেশে ফেরার পর স্থায়ী কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ দেওয়া হবে। বিদেশে কর্মসংস্থান এবং প্রবাস-আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কর্মীদের কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য আরও অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হবে। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে শ্রমশক্তি রপ্তানির উদ্যোগ ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বিদেশে আরও ২৩টি শ্রম উইং খোলার যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে, তা দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।

নগরায়ন : পরিকল্পিত উন্নয়ন

১৮.১ ২০১১ সালের লোক গণনা অনুসারে বাংলাদেশে শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ২০ লাখ। নগরায়নের মাত্রা প্রায় ২৮ শতাংশ। নেপাল বাদ দিলে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশেই প্রতিবছর সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ হারে শহরের জনসংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু সেই তুলনায় নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও ভৌত অবকাঠামো বাড়ছে না। অপরিকল্পিত নগরায়ন নাগরিক জীবনে সৃষ্টি করছে দুঃসহ সমস্যা ও দুর্ভোগ। আওয়ামী লীগ আগামীতে সারাদেশের জন্য একটি সমন্বিত জাতীয় নগরায়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন কমানোর লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। ইউনিয়ন সদর, উপজেলা সদর ও শিল্পাঞ্চলগুলোতে পরিকল্পিত জনপদ ও গ্রামীণ-শহর গড়ে তোলা হবে। অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে কৃষি জমি ও জলাশয় হ্রাসের হার কমানো এবং ভূমির সর্বানুকূল ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

১৮.২ রাজধানী ঢাকার উন্নয়নের জন্য যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, দ্রুতগতিতে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। ঢাকার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ কমানোর লক্ষ্যে যে ৪টি উপশহর বা স্যাটেলাইট শহর নির্মাণের বাস্তবায়নাধীন পরিকল্পনা দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। ঢাকার যানজট নিরসনে নির্মাণাধীন ফ্লাইওভার ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েগুলোর

নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা হবে। পরিকল্পিত মেট্রোরেল, মনোরেল, সার্কুলার রেলের নির্মাণকাজ দ্রুত এগিয়ে নেওয়া হবে। এ ছাড়া আরও ছোট-বড় উড়াল সেতু, টানেল এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হবে। ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ভৌগোলিক সুষম বিন্যাস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় সদরের জন্য যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়নের কাজ দ্রুততর ও বিস্তৃত করা হবে। জেলা সদরসহ পুরনো শহরগুলোর পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

১৮.৩ পরিকল্পিত নগরায়ন ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং নগর প্রশাসনের বিকেন্দ্রায়ন করা হবে।

গণমাধ্যম ও তথ্য অধিকার

১৯.১ সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং অবাধ-তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার নীতি অবিচলিতভাবে অব্যাহত রাখা হবে। জনগণের তথ্য জানা এবং সরকারের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য কমিশনকে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির বিপুল বিকাশের ফলে সামাজিক গণমাধ্যম এবং অনলাইন পত্রিকার ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনলাইন পত্রিকা এবং সামাজিক গণমাধ্যমের অপব্যবহার রোধ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা এবং প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দেওয়া হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে আরও অধিক সংখ্যক কমিউনিটি রেডিও-র লাইসেন্স দেওয়া হবে।

১৯.২ সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত অষ্টম মজুরি বোর্ড বাস্তবায়িত করা হবে। পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

জাতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

২০.১ বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশে আওয়ামী লীগ সরকারের অনুসৃত নীতি ও কর্মপরিকল্পনা অব্যাহত থাকবে। বাংলা ভাষা সাহিত্য, চারু ও কারুকলা, সংগীত, যাত্রা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ শিল্পের সব শাখার ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধন ও চর্চার

ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ানো হবে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ, প্রগতিশীল বিকাশ, চর্চা, মেলা, উৎসবসহ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগসমূহকে উৎসাহিত করা হবে।

প্রত্যেক উপজেলায় মুক্তমঞ্চ নির্মাণের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, গবেষণা ও উৎখননকে উৎসাহিত করা হবে। প্রত্নসম্পদ ও দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনের জন্য আরও জাদুঘর নির্মাণ করা হবে।

২০.২ জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। কোরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না। সকল ধর্মের শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। প্রতি জেলা ও উপজেলায় একটি করে উন্নত মসজিদ নির্মাণ করা হবে। অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কার ও উন্নত করা হবে।

২০.৩ যে কোনো মূল্যে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদ নির্মূল করা হবে। সকল ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতিকে দৃঢ় করার জন্য সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি আইনগত রক্ষা কবচের ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হবে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও প্রচার নিষিদ্ধ করা হবে এবং একটি বিজ্ঞানমনস্ক উদার মানবিক সমাজ গড়ে তোলা হবে।

মুক্তিযুদ্ধের গৌরব ও মুক্তিযোদ্ধার কল্যাণ

২১.১ রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গৌরব সমুন্নত রাখা হবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি প্রতিরোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষায় গৃহীত কর্মসূচি ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলো সম্পন্ন করা হবে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত প্রতিটি– যুদ্ধক্ষেত্র, বধ্যভূমি, গণকবর চিহ্নিত ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান/লোকালয়ে সাইট মিউজিয়াম ও পাঠাগার গড়ে তোলা হবে।

২১.২ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা, চিকিৎসাসেবা, বার্ধক্যকালীন ভরণ-পোষণ, তাদের সন্তানদের চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, অনুন্নত সম্প্রদায় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

২২.১ সংসদে পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী পাস করে আওয়ামী লীগ '৭২-এর সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সকল ধর্মের সমান অধিকার এবং

দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-জাতিগোষ্ঠী ও উপজাতিদের অধিকার ও মর্যাদার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে ধর্মীয় ও নৃ-জাতিসত্তাগত সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবসান এবং তাদের জীবন, সম্পদ, উপাসনালয়, জীবনধারা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা দৃঢ়ভাবে সমুন্নত থাকবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জমি, বসতভিটা, বনাঞ্চল, জলাভূমি ও অন্যান্য সম্পদের সুরক্ষা করা হবে। সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি, জলাধার ও বন এলাকায় অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অনগ্রসর ও অনুন্নত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত ও চা-বাগান শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা এবং সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

২২.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির অবশিষ্ট অঙ্গীকার ও ধারাসমূহ বাস্তবায়িত করা হবে। পার্বত্য জেলাগুলোর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হবে এবং তিন পার্বত্য জেলার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখা, বনাঞ্চল, নদী-জলাশয়, প্রাণিসম্পদ এবং গিরিশৃঙ্গগুলোর সৌন্দর্য সংরক্ষণ করে তোলা হবে। এই তিন জেলায় পর্যটন শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের বিকাশে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

প্রতিরক্ষা

২৩.১ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সশস্ত্র বাহিনীকে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখার যে নীতি নিয়েছিল, তা অব্যাহত থাকবে। দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন। তারই আলোকে আওয়ামী লীগ সরকার যে ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে, তা অব্যাহত থাকবে। স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীকে আরও শক্তিশালী, আধুনিক, দক্ষ অজেয় বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, যানবাহন সংগ্রহ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আধুনিক এবং যুগোপযোগী করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

২৩.২ প্রতিরক্ষা বাহিনীর অভ্যন্তরীণ স্বশাসন, শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা সমুন্নত রাখা হবে। ইতোমধ্যে পদোন্নতি, পদসমূহের শ্রেণিবিন্যাস উন্নত করা হয়েছে। জ্যেষ্ঠতা, মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা হবে।

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন ও অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধাসহ গৃহীত বহুমুখী কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে।

২৩.৩ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সমুন্নত রাখা ও বৃদ্ধি করার উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

খেলাধুলা ও ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা

২৪.১ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, ভলিবল, গলফ, ভারোত্তলন, সাঁতার, জিমন্যাস্টিক প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের পারদর্শিতা এবং মানোন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এ জন্য ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং আর্থিক প্রণোদনা বাড়ানোর ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। ক্রীড়া সংগঠন এবং জাতীয় ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। ক্রীড়াঙ্গনে দলীয়করণ, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

২৪.২ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন ক্রীড়া ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের বিভিন্ন খেলাধুলায় পারদর্শী করে তুলতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় মাঠ, স্টেডিয়াম প্রভৃতি অবকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি পর্যাপ্ত ক্রীড়া সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

এনজিও ও বিধিবদ্ধ সিভিল সোসাইটি সংগঠন

২৫.১ এনজিও ব্যুরোতে ও অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আইনানুগ কর্মকাণ্ডে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নিজস্ব বিধি মোতাবেক স্বশাসিত সংগঠন হিসেবে পরিচালিত হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস এবং আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এনজিও এবং বিদেশি সাহায্যপ্রাপ্ত বিধিবদ্ধ সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলো দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে পারবে না।

পররাষ্ট্রনীতি

২৬.১ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ যে পররাষ্ট্রনীতি পুনঃস্থিত করেছে, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত 'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' এই নীতিভিত্তিতে তা অব্যাহত রাখা হবে। এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা ও সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক, পারস্পরিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন অংশীদারিত্বকে সম্প্রসারিত করা এবং তার মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন হচ্ছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অভীষ্ট লক্ষ্য।

২৬.২ ভারত, মিয়ানমার, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকাসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ এবং দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত করা হয়। ভারতের সঙ্গে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, স্থল সীমান্ত চিহ্নিতকরণ ও ছিটমহল হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন এবং দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও নিরাপত্তা সহযোগিতাসহ সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। ভারত, ভুটান ও নেপালের সাথে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও অভিন্ন নদীর অববাহিকাভিত্তিক যৌথ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বন্ধ এবং রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের এবং অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থানকারী রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধৈর্যশীল প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের সীমান্তকে শান্তির সীমান্তে পরিণত করা হবে।

২৬.৩ আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (এআরএফ), এশিয়া কো-অপারেশন ডায়ালগ (এসিডি), এশিয়া ইউরোপ মিটিং (আসেম)-সহ গুরুত্বপূর্ণ সকল ফোরামে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে এবং সার্ক, বিমসটেক, ডি-৮ প্রভৃতি ফোরামগুলোকে আরও ফলপ্রসূ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ইন্ডিয়ান ওশান রিম এসোসিয়েশন (আইওআরএ)-এ আরও কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরে বাংলাদেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখা হবে। বিসিআইএম (বাংলাদেশ চায়না ইন্ডিয়া মিয়ানমার) ইকোনমিক করিডোরের উদ্যোগসমূহে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা হবে।

২৬.৪ বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বঙ্গোপসাগরে আমাদের যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভারতের সাথে মামলার নিষ্পত্তির মাধ্যমে যে এলাকায় আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে সে সকল এলাকায় সকল প্রকার জৈব ও খনিজ সামুদ্রিক সম্পদ এবং মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও আহরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবলের ব্যবস্থা করা এবং এই সমুদ্র অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে গৃহীত সকল উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

২৬.৫ বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে জঙ্গিবাদ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো শক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ মোকাবিলায় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং এ সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে।

২৬.৬ মুসলিম উম্মাহর সংহতি এবং ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) কাঠামোয় সহযোগিতার ক্ষেত্রকে আরও জোরদার ও ফলপ্রসূ করা হবে।

সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহসহ মালয়েশিয়ায় বর্তমান শ্রমবাজারকে সুসংহত রাখা ও সম্প্রসারণ করার পাশাপাশি নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। এ সকল অঞ্চলে বাণিজ্য সম্পর্ককে বহুমুখী করে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

ইন্দোনেশিয়াসহ দূরপ্রাচ্য, আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহ, অস্ট্রেলিয়াসহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ এবং আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে আরও নিবিড় ও বহুমুখী করার কাজ অব্যাহত থাকবে। ইতোমধ্যে খোলা নতুন ১০টি মিশনকে সক্রিয় করার পাশাপাশি আরও ৯টি মিশন খোলা হবে।

২৬.৭ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, কানাডা, রাশিয়া, চীনসহ উন্নত ও নেতৃস্থানীয় অর্থনীতির দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা হবে। এসব দেশের সঙ্গে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়নসহ সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে।

২৬.৮ বাংলাদেশের অভিবাসী কর্মজীবীদের এবং সকল প্রবাসীর স্বার্থ সুরক্ষায় এবং তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

২৬.৯ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

২৬.১০ জাতিসংঘে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখা হবে। জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়নের জন্য আমাদের কূটনৈতিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। জাতিসংঘ গৃহীত জননেত্রী শেখ হাসিনার জনগণের ক্ষমতায়ন মডেলকে জাতিসমূহের কাছে আরও জনপ্রিয় ও অনুসরণীয় করে তোলার জন্য বিশেষ কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

দেশবাসীর প্রতি আহ্বান

প্রিয় দেশবাসী,

আমরা আমাদের কথা রেখেছি। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আমরা যেসব অঙ্গীকার করেছিলাম তা পালন করেছি। সংকট মোচন করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার যে কর্মসূচি দিয়েছিলাম, অত্যন্ত সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমরা তা বাস্তবায়িত করেছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও অনেক বেশি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আমরা জানি, আমাদের দেশের সর্বস্তরের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন, তাদের অক্লান্ত শ্রম-ঘাম, মেধা এবং দেশ গঠনে আমাদের তরুণ প্রজন্মের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলেই বিগত পাঁচ বছরের সাফল্যগুলো অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। আত্মত্যাগ ও উৎসর্গ ছাড়া মহৎ কিছু অর্জন করা যে সম্ভব নয়, আপনারা তাও প্রমাণ করেছেন। আমরা তাই আমাদের প্রিয় দেশবাসী– আপনাদের অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন ও শুভাশিস জানাই আমাদের কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী এবং প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা যুবসমাজকে। আমরা আজ দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে পারি, অতীতের অন্ধকার ঘুচিয়ে বাংলাদেশ এখন আলোকোজ্জ্বল সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছে। আমরা সবাই আলোর পথযাত্রী।

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে উন্নয়ন, অগ্রগতির যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও পথ রচনা করেছি, সে পথ থেকে কোনো অপশক্তি আমাদের বিচ্যুত করতে পারবে না। আমরা রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দ্বিতীয় মেয়াদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি– জাতীয় সনদ ২০১৪ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। আমাদের বিশ্বাস, উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং দেশকে শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে আপনারা আরেকবার দেশ সেবার সুযোগ দেবেন। দেশবাসী সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত হবে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, অপুষ্টির অভিশাপ দূর হবে; দারিদ্র্যের লজ্জা ঘুচে যাবে, নিরক্ষরতা দূর হবে, শিক্ষিত দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠবে, শিল্প-সভ্যতার ভিত্তি রচিত হবে; প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছবে, বেকারত্বের অবসান ও কোটি কোটি তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে, সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে; যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে, পরিকল্পিত নগর-জনপদ গড়ে উঠবে, রাজধানী ঢাকা যানজটমুক্ত তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত হবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ সমৃদ্ধির সোপানে পা রাখবে। রাজনীতি থেকে হিংসা, হানাহানি, সংঘাতের অবসান হবে, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়নের ধারা থেকে বাংলাদেশ বেরিয়ে আসবে। গড়ে উঠবে একটি সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

আমরা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে জাতিকে উপহার দেব আমাদের ভিশন– নতুন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপকল্প-২০৪১। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের পর্যায় পেরিয়ে এক শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ, সুখী এবং উন্নত জনপদ। সুশাসন, জনগণের সক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন হবে এই অগ্রযাত্রার মূলমন্ত্র। এর মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হবে তিন স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অর্থায়নের কৌশল নির্ধারণ করা হবে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। আর এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে মূলত স্থানীয় সরকার। এজন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হবে প্রতিসংক্রম এবং স্থানীয় প্রশাসন হবে মূল নির্বাহী শক্তি। নারীর ক্ষমতায়ন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হবে এই অগ্রযাত্রার নিয়ামক উপাদান। সরকারি বাজেটের সিংহভাগ বাস্তবায়িত হবে স্থানীয় স্তরে, এ দায়িত্ব পালন করবে স্থানীয় প্রশাসন। এক বিকেন্দ্রায়িত শাসন ব্যবস্থা হবে বাংলাদেশের বিশেষত্ব। এই বিবর্তনের নিশ্চয়তা দেবে গণতান্ত্রিক আচরণ, পরমতসহিষ্ণুতা, সমঝোতা এবং একনিষ্ঠভাবে জনকল্যাণে নিবেদন। দেশমাতৃকার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে নতুন প্রজন্ম– প্রাণ-প্রাচুর্যভরা সৃষ্টি সুখের উল্লাসে টগবগে বাংলাদেশের যুবসমাজ। আমরা তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের পথে 'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' শিরোনামের এই ইশতেহার।

প্রিয় দেশবাসী,

অতীতের মতো এবারও আমরা আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন চাই। আপনাদের ভোটে আরেকবার দেশসেবার সুযোগ চাই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং 'হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী'র প্রতীক, স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতীক নৌকায় ভোট দিন। আসুন, আমরা বিভেদ ভুলে সম্মিলিতভাবে শান্তি উন্নয়ন গণতন্ত্র ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাই। হত্যা সন্ত্রাস হানাহানি সংঘাত-রক্তপাতের চির অবসান ঘটাই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনারবাংলা গড়ে তুলি। দেশ গড়ার এই সংগ্রামে জনগণের জয়– বাংলাদেশের জয় অনিবার্য। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২৮ ডিসেম্বর ২০১৩

রূপকল্প-২০২১
এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
বাড়ি- ৫১/এ, সড়ক- ৩/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা- ১২০৯
ফোন- ৯৬৭৭৮৮১, ৯৬৭৭৮৮২, ৮৬৫২৩৮৮, ফ্যাক্স- ৮৬২১১৫৫
ই-মেইল- alpartyoff@hotmail.com, ওয়েবসাইট- www.albd.org